একুশে ২৪

আমার ভাষা

Anusandhan
dreaming success

অনুসন্ধান
কলকাতা

আমার ভাষা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকল ভাষা-শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

একুশে ফেব্রুয়ারি
২০২৪

অনুসন্ধান
কলকাতা

AMAR BHASHA

A collection of articles to commemorate
the language martyrs, on the occasion of
International Mother Language Day

Published as E-book on
21 February, 2024

On behalf of Anusandhan-Kolkata
by Mr. Sahabul Islam Gazi
from Sama Bhaban, Srijan Park
Nabapally, Barasat, N. 24 Pgs., PIN- 700126

Ph : 9051270080, 8777688756
E-mail : anusandhan.kolkata@gmail.com

Cover Design & Leser Setting :
Safik Ali
Chhoto Jagulia, Barasat, N. 24 Pgs.
Ph : 6289786260

আমাদের কথা

অনুসন্ধান কলকাতা-র প্রকাশনা উপসমিতির উদ্যোগে প্রস্তুত হ'ল 'আমার ভাষা', আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা-শহীদদের স্মৃতির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

মেধার অন্বেষণ ও পরিচর্যা, তথা তরুণ মনে সমাজ-সংস্কৃতি-চেতনা জাগিয়ে তোলার যে কষ্টসম্ভব স্বপ্ন নিয়ে অনুসন্ধান কলকাতার পথচলা শুরু ছয় বছর আগে, বর্তমান উদ্যোগ তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কঠিন কোনো স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দরকার হয় স্বপ্নকে ছোট ছোট অর্জনযোগ্য লক্ষ্যে ভেঙে নেওয়া। সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলা যাচ্ছিল। করোনা অতিমারি স্বাভাবিকভাবেই গতিপথ বদলে দিল। এল ভার্চুয়াল মাধ্যম। এর অসুবিধার দিক অনেক- ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সেগুলো বুঝে নেওয়া গেল।

কিন্তু, ভার্চুয়াল মাধ্যমের একটা সুবিধার দিকও আছে। আলাপচারিতার আয়োজন হোক কিংবা পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থাপনা- দু ক্ষেত্রেই ঝঞ্ঝাট অনেক কম। খরচ তো কম বটেই! তবে আন্তরিকতায় কমতি কখনোই ছিল না। এখনও নেই। গত চার বছরে কয়েকশো মাঝারি মানের আলাপচারিতা হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ঘণ্টার পর ঘন্টা পড়াশোনার সেশন হয়েছে আরো বেশি। ছোটখাটো আলাপ আলোচনার কথা ছেড়ে দেওয়াই গেল। এই সময়কালে বেশ কয়েকটি ই-বুক প্রকাশিত হয়েছে। সূচনা হয়েছিল 'প্রণতি' শিক্ষক দিবস-২০২১ সংখ্যার মাধ্যমে। দ্বিতীয়টি ছিল জাতীয় গণিত দিবস অর্থাৎ গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজন-এর জন্মদিবসে। মাতৃভাষা দিবস সংখ্যা এই নিয়ে দু'টি- ২০২২ ও ২০২৪ -এ। ভার্চুয়াল মাধ্যমের সাহায্য পাওয়ায় এইসব প্রকাশনা সহজসাধ্য হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশিষ্টজনেরা লেখা পাঠিয়েছেন।

নানা আঙ্গিকে সেজেছে এবারের মাতৃভাষা দিবস সংখ্যাটি। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, ইতিবৃত্ত, সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ যেমন উঠে এসেছে বিভিন্ন লেখায়, তেমনি বাংলা ভাষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাও গুরুত্ব পেয়েছে বিভিন্ন লেখায়। স্থান পেয়েছে ভিন্ন স্বাদের প্রাসঙ্গিক লেখাও।

লেখা সংগ্রহ থেকে প্রকাশ করার কাজ- প্রকাশনা উপসমিতির পাশাপাশি যাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভব হ'ত না তিনি সংগঠনের প্রাণপুরুষ এক ও অনন্য নায়ীমুল হক সাহেব। তাঁর নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করতেই হবে।

আশা করি প্রথম কয়েকটি উদ্যোগের মত বর্তমান প্রকাশনাটিও সর্বস্তরে সমাদৃত হবে।

আশা করি প্রথম কয়েকটি উদ্যোগের মত বর্তমান প্রকাশনাটিও সর্বস্তরে সমাদৃত হবে।

একুশে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

সূ চি প ত্র

	লেখক	পৃষ্ঠা
• মাতৃভাষা ও আগামী প্রজন্ম	সুরঞ্জন মিদ্দে	৫
• আমার বাংলা ভাষা	অমিত দে	১২
• ভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ কি বাঙালির খামখেয়ালিপনার নিদর্শন!	ড. সুব্রত কুমার পাল	১৩
• শবর সমাজের রূপকার-শবরমাতা মহাশ্বেতা দেবী	অমরেন্দ্র মহাপাত্র	১৭
• আমার ভাষা	ইতি ঘোষ	৩০
• বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ ঃ একটি কূট প্রশ্ন	সজল রায়চৌধুরী	৩১
• আমার ভাষা	আর্যদীপ দাস	৩৪
• বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ	উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫
• আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা ও মাতৃভাষা চর্চা	সৌমেন রায়	৩৯
• ২১শে ফেব্রুয়ারি–'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর প্রাক্কালে কিছু কথা	বিকাশ চন্দ্র আড়ি	৪৩
• 'একুশে' হল মাতৃভাষা আগলে রাখার দিন		৪৫
• আত্ম কথা/সবকী কথা	দীপশ্রী দাস সরকার	৫১
• আমার ভাষা	আয়ান চ্যাটার্জী	৫২
• মাতৃভাষা	যুথিকা মণ্ডল	৫২
• চেতনায় একুশে	শুভজিৎ পাত্র	৫৩
• মাতৃভাষা		৫৩

অনুসন্ধান কলকাতা

কার্যনির্বাহী কমিটি - প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক মতিয়ার রহমান খান, **সভাপতি ঃ** ড. দেবব্রত মুখার্জী (কলকাতা), **সহ-সভাপতি ঃ** ড. নিপম কুমার সইকিয়া (অসম), ড. শুভময় দাস (কলকাতা), ড. কমল কৃষ্ণ দাস (মালদা), ড. স্বাগতা বসাক (কলকাতা)।

সম্পাদক ঃ সাহাবুল ইসলাম গাজী, **সহ-সম্পাদক ঃ** শ্রী গৌরাঙ্গ সরখেল, শ্রীমতী মিতালি মুখার্জী, **কোষাধ্যক্ষ ঃ** আখের সর্দার, **গবেষণা বিভাগের আহ্বায়ক ঃ** শ্রী তমাল ঘড়াই, শ্রী অনির্বাণ ভট্টাচার্য, শ্রীমতী চন্দ্রিমা সেন, নাজিরুল হক, **প্রযুক্তি বিভাগের আহ্বায়ক ঃ** নাজিমুল হক, **চিকিৎসা বিভাগের আহ্বায়ক ঃ** ডাঃ কুনালকান্তি মজুমদার **সদস্য ঃ** নায়ীমুল হক, ড. নওয়াজেশ মণ্ডল (মেক্সিস, আমেরিকা), ড. শামসুল আলম, কাজী নিজামুদ্দিন, আশরাফুল হক (নিউ দিল্লি), ইয়াসিন মণ্ডল (নিউ দিল্লি), শ্রীমতী পিঙ্কি দাস, শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা শীল, সেকেন্দার মণ্ডল, আসাদুজ্জামান মণ্ডল, সায়ন কর্মকার, নাফিসা ইসমাত, প্রত্যুষ মুখার্জী, মাঈসুরা তৈয়েবা।

প্রকাশনা উপসমিতি - আহ্বায়ক ঃ কাজী নিজাম উদ্দিন, **প্রধান উপদেষ্টা ঃ** ড. মুজিবর রহমান, **উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ** ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (কলকাতা), অধ্যাপক ড. মতিয়ার রহমান খান, ড. নিপম কুমার সইকিয়া, ড. কমলকৃষ্ণ দাস, **সম্পাদনা সহযোগী ঃ** প্রশান্ত ভট্টাচার্য, তাপস মুখোপাধ্যায়, সাহাবুল ইসলাম গাজী, গৌরাঙ্গ সরখেল, শর্মিষ্ঠা শীল, নায়ীমুল হক, অঞ্জন মজুমদার, আপ্পু পাল, আকাশ পারভেজ।

মাতৃভাষা ও আগামী প্রজন্ম

— সুরঞ্জন মিদ্দে

আমার নিজের ভাষা। আমার নিজের সংস্কৃতি। আমার নিজের মায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি। আমার বাবা প্রবাসী হতে পারে। আমার মা বিদেশি নয়। আমি এবং আমার স্ত্রী একই ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম করছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমার ছেলে প্রবাসী হলেও স্বদেশের বৌমা কি সঙ্গে যাবে? সংকট সেখানেই। নাকি আমার ছেলে বিদেশের স্থায়ী নাগরিক হয়ে যাবে? আমার পরের প্রজন্ম কি বাবার ভাষা ও ঠাকুরদা-ঠাকুরমার ভাষা-সংস্কৃতি লালন করার সুযোগ পাবে? আমরা একুশ শতকের এমন এক সময়ে এসেছি আমাদের অনেককে দেশ ছাড়তে হবে। আমাদের রাজ্য ছাড়তে হবে। এটাই আসল আর্থসামাজিক চেহারা। আমি ঝাড়খণ্ডবাসী এক বাঙালি বন্ধুকে জানি, যিনি সাইকেলে করে দশ মাইল দূরে ঘাটশিলায় আসেন; মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতির লড়াই করতে আসেন। তাঁর সাইডব্যাগে থাকে বাংলা কবিতার বই আর দেশ পত্রিকা, কলকাতার কলেজ স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত মাতৃভাষার বইপত্র। বন্ধুটির উদ্যোগে ঘাটশিলায় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের চর্চা হয়। বিভূতিভূষণ সংসদ সংলগ্ন পল্লির প্রতিটি বাঙালি বাড়ির নামকরণ করা হয়েছে বিভূতিভূষণের গ্রন্থের নামে কিংবা কোনও চরিত্রের নামে। দেখে ভাল লাগল। দুঃখ পেলাম আস্তে আস্তে অনেকেই অবাঙালিদের কাছে বাড়ি বিক্রি করে কলকাতায় চলে আসছে। আবার বিদেশের চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা যাচ্ছে ফিরে তো আসছেই না আবার অন্যদের নিয়ে চলে যাচ্ছে।

মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতির উভয় সংকট। ঘরে ও বাইরে অস্তিত্বের সংকটের মোকাবিলায় ঐক্যই আমাদের শক্তি। সংগ্রামই আমাদের একমাত্র পথ। নিখিল ভারত সমন্বয় সমিতির উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। শুধু ধন্যবাদ নয়, সংগ্রাম সামিল হতে চাই।

আমাদের মাতৃদেশ স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতার ভাগাভাগি ধর্মের ভিত্তিতে নয়, ভাষার ভিত্তিতে। মাতৃভাষার জন্য বঙ্গদেশ ভাগ হয়েছে। মাতৃভাষা তো ভাগ হয়নি। ভাষা ভাগ হয় না। আমার মাতৃভাষা, আমার ভাষাকে কেউ ভাগ করতে পারবে না। ভাষাবহনকারী শক্তিগুলো ক্রমশ দেশ থেকে বিদেশে;বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে। সেই স্বাভাবিক সংকটকে মেনেই

সংগ্রামে সামিল হতে হবে। প্রবাসে এবং মাতৃদেশে বারবার যেতে-আসতে হবে। আদান-প্রদানকে সুগম করতে হবে। ইউরোপের দেশগুলোতে পাসপোর্টও লাগে না, ভিসাও লাগে না। ডলারও নয়।

আমার ভাষা, আমার সাহিত্য, আমার সংগীত, আমার কারুকার্য ও আমার নৃত্যকলার বারবার পরস্পরের মুখোমুখির মধ্যে সমৃদ্ধ হব। সেজন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন পাসপোর্ট-ভিসার সরলীকরণ কিংবা সহজলভ্যতার জন্য সংগ্রাম। এই সংগ্রাম আমার সংগ্রাম, আমাদের সংগ্রাম; আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংগ্রাম।

আমার ভাষা ও একুশ শতক

নিজের ভাষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে কোনও জাতির প্রবহমান গতির পরিচালক হতে পারে না। একটি বলিষ্ঠ জাতি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব পেতে পারে তার মাতৃভাষার প্রকাশের মাধ্যমে। ইউরোপ এত এগিয়ে গেছে তার মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে। জাপান এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। এশিয়া মহাদেশের সূর্যোদয়ের এই দেশটি মাতৃভাষাকে সম্পদ সঙ্গী করে শীর্ষস্থানে। ভাবতে বিস্ময় জাগে ছোট দ্বীপমালা স্বমহিমায় মাতৃ-সংস্কৃতির নদীতে নৌকা ভাসিয়ে পৃথিবীর মহাসমুদ্রে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলেছে। জাপানের সবচেয়ে বড় ভাষা গবেষণাকেন্দ্রের কম্পিউটারেও মাতৃভাষার জয়যাত্রা অব্যাহত রাখতে পেরেছে।

জাতীয় ভাষা মাতৃভাষাকে কার্যকর করার জন্য সংগ্রাম চালানোর সময় এসেছে। বিশেষ করে 'ত্রিভাষা সূত্র'কে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে হিন্দি-ইংরাজির সঙ্গে মাতৃভাষাকে তৃতীয় ভাষা করার জন্য আমরণ সংগ্রাম চালাতে হবে।

বাঙালির তৃতীয় দুনিয়ার বাংলা সাহিত্য ক্রমশ এক নতুন মাত্রা এনে দেবে। বাংলা ভাষায় লেখা অবাঙালি অথবা অভারতীয়দের জীবনকথা সাহিত্যে অভিনব ইঙ্গিত বহন করবে। বিশ শতকের 'আরণ্যক' থেকে 'অরণ্যের অধিকার'-এর মত আরও অনেক ধ্রুপদী সাহিত্যের অপেক্ষার জন্য সহমর্মী বন্ধুদের সাহচর্য আশু প্রয়োজন।

বাঙালির প্রথম পৃথিবী যদি বাংলাদেশ রাষ্ট্র হয়, তবে দ্বিতীয় জগৎ পশ্চিমবঙ্গ আর তৃতীয় দুনিয়া হচ্ছে প্রবাসী বাঙালিদের সংগ্রাম আর সংগঠন। অত্যন্ত আন্তরিকভাবে নিজের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা। সেই সমস্ত যন্ত্রণার সৃষ্টি আসাম থেকে আন্দামান, নাগপুর থেকে নরওয়ে ছড়িয়ে আছে। তৃতীয় ভাষা আর তৃতীয় দুনিয়ার আন্তরিক

সংগ্রামই বাঙালির পরবর্তী প্রজন্মের দাবি হবে। শুধু বঙ্গদর্পণ নয় ভারতদর্পণ তথা বিশ্বদর্পণ । একুশ শতকের স্বপ্ন সেই দিশার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সেতুবন্ধন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সম্মেলন

আমাদের ঐক্য বলতে ইউনিফর্মিটি বোঝাবে না। আমাদের একতা, বৈচিত্র্যকে মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। 'লালন মেলা' একটি বিশেষ সেতুবন্ধন। লালন মেলা, বিজয় মেলা, বাউল-ফকির মেলা, পৌষমেলা, জয়দেবের মেলা, গঙ্গাসাগর থেকে আরও আরও অনেক মেলা আর উৎসব সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করবে। বইমেলা তো আছেই। বাঙালি মেলা;প্রবাসে সংখ্যালঘু বাঙালির চিত্তকে ভরিয়ে দেবে। বিকশিত হবে সৃষ্টির সমস্ত রহস্য। শতফুল বিকশিত হবে। 'লজ্জা' উপন্যাসের সুরঞ্জনের সঙ্গে সুবোধ, সমরেরা একা নয় সহস্র। আরও হতে পারে;অর্থনৈতিক সেতুবন্ধন। গাঢ় বন্ধন। ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান নেপাল ভুটান শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ মিলে তৈরি হবে অর্থনৈতিক অঞ্চল। তার থেকে আসবে সংস্কৃতির আদান-প্রদান। সেখানে মুসলিম মৌলবাদ, হিন্দু মৌলবাদ, খ্রিস্টীয় মৌলবাদ থাকবে না। থাকবে মেলামেশার মেলার প্রাণ মিলনমেলা। শুধু নদী ক্রমশ সমুদ্রে মিশে যাবে।

আরও আছে—শারদীয় সংখ্যা, ঈদ-সংখ্যা, বড়দিন সংখ্যা, পত্র-পত্রিকার আদান-প্রদান, লেন-দেন। দেওয়া-নেওয়া, চাওয়া-পাওয়া। আর থাকবে পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম ভাষার গ্রন্থাগার। আর এক ধাপ এগিয়ে বলতে ইচ্ছা করছে; সেটার নাম , দৈনিক খবরের কাগজ। একশো বছরেরও বেশি, প্রায় দেড়শো বছর ধরে আমাদের স্বজন ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের ঘরে ঘরে। কেউ বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে। শুধু ঝাড়খণ্ড বা উত্তর বিহার নয়, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ-সহ আরও অনেক শহরে আমাদের আত্মার অংশ বিরহীদের বৃন্দাবন আর আগের মত নয়। নববর্ষ আর নাট্যচর্চা, বেঙ্গলি ক্লাব, ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র যোগসূত্রের ভিত্তি ছিল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সংযোগ রেখে বিশ্বায়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে।প্রবাসী চ্যানেল হতে পারে। হতে পারে দৈনিক সংবাদপত্র, সমন্বয় সমিতি। শাখা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। শাখা বাংলা আকাদেমি। শাখা বিশ্ববিদ্যালয়ও।

উনিশ শতকের সেরা সাহিত্যিকরা ইংরেজি দিয়ে শুরু করলেও মাতৃভাষায় তাদের সৃষ্টিতে স্বতঃস্ফূর্ততা প্রকাশ করেছিলেন। মহাকবি মাইকেল তো প্রবাসে বসেই বুঝতে পেরেছিলেন মাতৃভাষার মহাভাণ্ডারে রত্নের অভাব নেই। বিশ্বকবির সমস্ত সৃষ্টিই তো মাতৃভাষায়। বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

মাতৃভাষা সমস্ত সৃষ্টির ঈশ্বর

বাংলা ভাষা আমার মাতৃভাষা। বাংলা ভাষা আমার প্রাণের ভাষা। মাতৃভাষা আমার হৃদয় আলো করার ভাষা। আমার মাতৃভাষা বাংলাভাষা আমার সমস্ত শক্তির উৎস। দেশভাগ হতে পারে। রাষ্ট্র আলাদা হতে পারে। কিন্তু ভাষাকে কেউ আলাদা করতে পারবে না। কোনও দিনও পারবে না। ওপারের ভাষার নাম বাংলা ভাষা, এপারের ভাষার নাম বাংলা ভাষা। সারা পৃথিবীর প্রবাসী বাঙালির ভাষার নাম বাংলা ভাষা। মাঝখানে কোনও সীমানা আমরা বিশ্বাস করি না। কাঁটাতারও না। মাতৃভাষার কাছে কোনও ধর্ম নেই। বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষার কাছে কোনও রাজনীতি নেই। এখানে আমরা সবাই ভাইঃভাই। মাতৃভাষা সহোদর। এ একটি বৃহত্ত পরিবার। পাশপোর্ট একটু দূরে সরিয়ে দিলেও আমরা একই পরিবার আছি। থাকব চিরকাল। তাই তো কবি আবদুল গফফর চৌধুরী গেয়ে ওঠেন,

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে
ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ
ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলতে পারি।'

একুশে ফেব্রুয়ারি তাই বঙ্গদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের যে কোনও বাঙালির কাছে আত্মপ্রত্যয়ের দিন। এক শাশ্বত চেতনার বিশ্বময় প্রেরণার দিন। এক দিকে বাঙালির আত্মবলিদানের দিন। অন্য দিকে বাঙালির আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় করার দিন। একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু বাঙালির কাছে ঐতিহাসিক দিন নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসও। সমস্ত বিশ্ববাসীর কাছে মাতৃভাষার জয়গানের উৎসবও বটে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট। ভারতবর্ষ ভাগ হল। সৃষ্টি হল পাকিস্তান। শুরু হল অত্যাচার, নির্যাতন। বাঙালি জনগণের অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম শুরু হল। বাঙালি তার মাতৃভাষা বাংলার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলল। এইভাবে ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট থেকে ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাত্র ১৬৫২ দিনে বাঙালি প্রাণ দিতে প্রস্তুত হল। প্রাণের বিনিময়ে বাঙালি ফিরে পেল তার মাতৃভাষাকে। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হল। যার রাষ্ট্রভাষা বাংলা। অবশেষে ইতিহাসের ঢাকা আরও একধাপ এগিয়ে গেল। ২০০১ সালের ২ ফেব্রুয়ারিকে সম্মানিত করল বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জ। ১৮৮টি দেশের মানুষ সমস্ত পৃথিবীতে তাঁদের প্রিয় মাতৃভাষায় কথা বলবেন। ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক জাতি গঠনের বিশ্বশ্রেষ্ঠ আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি পেল। বাঙালি ভাষা

শহিদদের সম্মানিত হলেন। বাংলা ভাষা সারা বিশ্বে নতুন এক পথের সন্ধান দিল। সেই আলোকপথের এমন শক্তি যা দূরকে কাছে টানে। বিভেদকে বুকে বাঁধে। শুধু মাতৃভূমির জন্য সংগ্রাম নয়। মাতৃভাষার জন্য চরম আত্মত্যাগ; যার তুলনা ইতিহাসে নেই। বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম। ছাত্রদের নিরস্ত্র মিছিল। স্বৈরাচারী শাসকের রাইফেল থেকে বুলেট ছুটে এল। ঘটনাস্থলেই শহিদ হলেন আব্দুল জব্বার ও রফিকুদ্দিন আহমদ। রাত আটটায় শহিদ হলেন আব্দুল বরকত। গুরুতর আহত ১৭ জন। আহত আরও অসংখ্য জন। ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ দুপুর ১২টায় ছাত্রছাত্রীরা সেই ইতিহাসে যুক্ত করলেন একটি নতুন অধ্যায়। চির ভাস্বর একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় চেতনাকে উদ্ভাসিত করেছে। তাই এই দিন কোনও আবেগ বিহ্বলতার দিন নয়। এই দিন বাঙালির আত্মসমীক্ষার দিন। বিশেষ করে ভারতবর্ষের বাঙালির কাছে এক বড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন। আমাদের জাতীয় স্তরে আমাদের মাতৃভাষা কতটা বিকাশে সাহায্য করে। পশ্চিমবঙ্গেই সর্বস্তরে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। ১৯৯১ সালের লোকগণনা অনুসারে বাংলা ভাষা ভারতের দ্বিতীয় ভাষা। বাংলা ভাষা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম ভাষা। ৩০ কোটি বাঙালির ভবিষ্যৎ কী? ভাষাবিদ মহম্মদ শহীদুল্লাহ চরম সত্যি কথাটাই লিখেছিলেন, তআমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।' এটা কোনও আদর্শের কথা নয়। এটা একটা বাস্তব কথা।

মাতৃভাষা শুধু মানুষের সৃষ্টির বহ্নিশিখা নয়। জীবন জীবিকার প্রশ্নে মাতৃভাষা আজ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জের মুখে। সেই চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে বিশ্বায়নের বাজার। জাপান যুদ্ধ করে জয় করেনি। ভিয়েতনামও নয়। যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়েও জাপানি ভাষা পৃথিবীর অষ্টম স্থানে থেকেও মানব সম্পদের বিকাশ ঘটিয়েছে। আর আমরা ভারতীয় বাঙালিরা চতুর্থ স্থানে থেকেও কী করতে পারছি? রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে অসমের বরাক উপত্যকা রক্ত দিয়েছে। সেই পথই কি ভারতের বাঙালির শেষ ঠিকানা?

ভারতবর্ষের মত এক বৃহৎ দেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং আরও একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত লিখেছেন একই বাঙালি কবি। এ মহান কীর্তি শুধু বাঙালি কবির নয়, বাংলা ভাষারও। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরল কীর্তিতে আমরা বাঙালিরা গর্ববোধ করি। সৃষ্টিশীল সেই বাংলা ভাষাকে স্বাধীনতার এত বছর পরেও জীবন জীবিকার কাজে লাগাতে পারিনি। বাংলা ভাষাকে স্বশাসনের সর্বস্তরে ব্যবহার করতে পারিনি।

আমরা কোনও ভাষার বিরুদ্ধে নই। কিন্তু আমাদের মাতৃভাষার চর্চা চাই। আমি আমার মাতৃভাষায় জীবন-জীবিকা পেতে চাই। অন্তত সেই বাঙালির জন্য যে সমস্ত জীবনে কখনও ইংরেজি ভাষার বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে না। আমরা জানি, আমরা বলছি ইংরেজিও শিখতে হবে। কিন্তু সবাই কি সেই সুযোগ পাবে? মানে সবার জন্য কি ব্যবস্থা করা সম্ভব? গ্রাম ভারতে যে ৮০ শতাংশ মানুষ আছে, তাদের কথা কে ভাবছে? আসলে মাতৃভাষা আর মাতৃসংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষায় প্রাণিত করতে হবে সর্বস্তরের বাঙালিকে। একটি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন চারটি প্রধান উপাদান।

১) মাতৃভাষা, ২) মাতৃসংস্কৃতি, ৩) ভৌগোলিক সীমানা আর ৪) অর্থনীতি। একটার সঙ্গে আর একটার গভীর সম্পর্ক। একেবারে শিকড়ের সন্ধানে যেতে হবে। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -সহ সমস্ত বাঙালি লেখক বিদেশিভাষা ছেড়ে মাতৃভাষায় তাঁদের সাহিত্যকীর্তি সৃষ্টি করে গেছেন। যে কোনও স্রষ্টার সৃষ্টির সর্বোত্তম বিকাশ সম্ভব মাতৃভাষাতেই। বাঙালির কথা বেশি করে মনে পড়ছে। ঝাড়খণ্ড রাজ্যে বাংলাভাষীরাই সংখ্যালঘু অথচ সেখানে বাংলা ভাষা প্রধান ভাষার মর্যাদা তো পায়নি বরং সেখানে বাংলা ভাষা অবহেলিত। মাতৃভাষা মর্যাদা না পেলে জাতির এ লজ্জা ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে। ভাষা আন্দোলনের জোয়ার ঢাকা থেকে অসম বরাক উপত্যকা থেকে ঝাড়খণ্ডে গিয়ে পড়বেই।

সংকট মানুষকে একত্রিত করে। ভালবাসায় আমাদের এক হতে হবে। সেদিন বেশি দূরে নয়।

দেশবাসীর জন্যই সরকারি নীতি। তাঁদের আবেগের কি কোনও মূল্য নেই? চাই ঢাকা-কলকাতা-নাগপুরের আবেগের মেলবন্ধন। চাই শুধু সম্মিলিত চাপ। চাই সংগঠন। দল। ৩০ কোটি মানুষের মাতৃভাষা। একটি জাতির পরিচয় হয় মাতৃভাষার মাধ্যমে। জাতির চরিত্র, সংস্কৃতি গড়ে ওঠে মাতৃভাষাতেই। বিকল্প হয় না। শেষ ঠিকানা রাষ্ট্রসংঘ।

পুনশ্চ : একই বর্ণের লোক বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। আবার একই ভাষা যাদের, তারা ধর্মে এক নয়। পৃথিবীর কোথাও কি এক-এক ধর্মের এক-এক ভাষা বা এক-এক ভাষাগোষ্ঠীর এক এক ধর্ম দেখতে পাওয়া যায়?

১৯৪৭-এ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়। বাংলা ভাষাকে বাঙালি হিন্দুর ভাষা ও ইসলাম বিরোধী বলে প্রচার করা হয়। বাহান্নর মাতৃভাষার জন্য রক্ত দিয়ে, চূড়ান্ত পরিণতি মুক্তিযুদ্ধ; সর্বশেষে একটি স্বাধীন

রাষ্ট্র। যার নাম সার্বভৌম বাংলাদেশ। একুশ শুধু ভাষা সহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়, একুশ বাঙালির নিত্যদিনের প্রতিবাদের ভাষা।

ভাষা বহু দেশ ও কাল পেরিয়ে আসে আমাদের ঘরে। মাতৃভাষা বাংলা কলসির জল থেকে আন্তর্জাতিক তরঙ্গের রূপ। দিয়েছেন বাঙালিরা। এ সম্মান সমস্ত বাঙালির। ভাষার প্রবাস যাত্রা। আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠা।

'সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর পিছনে যে সব চালিকাশক্তি কাজ করছে, সে বিজ্ঞান নয়, কোনও মতাদর্শ নয়, বিশুদ্ধ চাকরি করার বাসনা। তৎসত্ত্বেও এই দুঃসহ অপমানকর অন্তর্জালা সরিয়ে রেখে সম্প্রতি আন্তর্জাতিকতার মুকুট পরেছেন বাংলা ভাষা জননী।

রবীন্দ্রনাথ পুনর্জন্ম পেলেন। বাংলা অক্ষরে লেখা বিমান উড়ল ৩২ হাজার ফিট উপরে, আবহমণ্ডল ছাড়িয়ে। এবং ভাষার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে এক অর্থে চিহ্নিত করা হয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিকতার দূত হিসেবে।

আজ আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে ৮০-১০০ পাতার ২৫-৩০টি চমৎকার সারগর্ভ বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ বেরোচ্ছে। সমস্ত মার্কিন মুলুক বাংলার জয়ধ্বনি করছে। যা সত্যকার ধর্মনিরপেক্ষ, সাংস্কৃতিক স্বভাকে উচ্চাসনা এক বাঙালির নবজন্মের ফসল। যার কালক্রমে বিশ্বব্যাপী সম্মান বাড়তে থাকবে।

আমার বাংলা ভাষা

—অমিত দে

এই যে আমার রোদে জলে
গাছ গাছালির বেড়ে ওঠা,
এই যে এতো বিদ্যে বুদ্ধি
খামারবাড়ি, দালান কোঠা,
এ সব কিছুর শেকড় বাকড় লুকিয়ে আছে সহজ পাঠে,
আ মরি বাংলাভাষা।

বুকের মধ্যে রবি ঠাকুর
রক্তধারার চলকে ওঠা,
চেতনমালির বাগান জুড়ে
শিউলি ঝরা, বকুল ফোটা,
একটা উঠোন ছড়িয়ে আছে
কাছাড় থেকে ঢাকা,
প্রাণ বিছানো সে পথ জুড়ে অনেক গর্ব আঁকা,
রঙীন কাচে রোদের ফলা
প্রথম ভালোবাসা,
আমার বাংলা ভাষা।

ভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ কি বাঙালির খামখেয়ালিপনার নিদর্শন!

—ড. সুব্রত কুমার পাল

একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে স্বীকৃত হলেও ঘটনা পরম্পরা এবং ঐতিহ্যগত দিক থেকে তা বাংলা ভাষার সঙ্গেই একাত্ম হয়ে সকল বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে 'আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা দিবস'-ই হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই দিনটিকে ঘিরে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে উৎসাহ, উদ্দীপনা, আবেগ ও ভালোবাসার স্ফূরণ লক্ষ্য করা যায় তার থেকে অনেকাংশে কম হলেও পশ্চিমবঙ্গবাসীও যথেষ্ট উৎসাহ নিয়েই দিনটি পালন করে। যদিও সে উৎসাহের প্রতিফলন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামাজিক মাধ্যমের বায়বীয় দেয়ালেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি আবেগ এবং ভালোবাসার উদ্দীপনার স্থায়িত্ব মাত্রই চব্বিশ ঘন্টা। আসলে একটিমাত্র দিনকে স্মরণ করে কি একটা ভাষাকে ভালোবাসা যায়? তা নিয়ে কি গর্ব অনুভব করা যায়? তা কি কখনো সম্ভব?

পশ্চিমবঙ্গবাসীর বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপতার নানাবিধ কারণ রয়েছে এবং সেগুলি বহুবার বহু জায়গায় বহুভাবে আলোচিতও হয়েছে। সরকারি ঔদাসীন্য, দীর্ঘ ঔপনিবেশিক দিন যাপনের কুফল, চাকরি এবং কাজের ক্ষেত্রে ইংরাজির প্রাধান্য এবং সেটাই প্রধান মাপকাঠি হয়ে ওঠা, হিন্দি ভাষার আগ্রাসন, শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা বই-এর অভাব ইত্যাদি নানারূপ কারণের মধ্যে একটি হল বাংলা ভাষার প্রতি মানুষের মানসিক হীনম্মন্যতা বা বিরূপতা। বহু মানুষই মনে করেন বাংলায় কথাবার্তা বললে কেমন যেন ক্যাবলা-ক্যাবলা, বোকা-বোকা লাগে। সেখানে ইংরেজি এবং হিন্দি অনেক বেশি ঝকঝকে এবং স্মার্ট। আমরা শুধুই যে এ ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করি তা নয়, সর্বক্ষেত্রে তার ব্যবহারিক প্রয়োগও করি। একেবারেই মধ্যমানের রেস্তোরাঁয় খেতে গেলে আমাদের মুখ দিয়ে আর জল কথাটি বেরোয় না; বলি 'ওয়াটার প্লিজ'। কিন্তু সমস্যা সেখানেও। যদি সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল হিন্দি বা ইংরেজিতে যাবতীয় বাক্যালাপ চালিয়ে যাওয়া যেত তাহলে কোন গোল বাঁধতো না। কিন্তু শ্রোতা এবং বক্তার জ্ঞানের

পরিধি সেখানে গিয়েও ধাক্কা খায় ফলে তার সঙ্গে অবধারিতভাবে যুক্ত হয় মাতৃভাষা বাংলা। এবং মুখ্যতঃ এই তিনের যোগফলে কথা বলতেই বাঙালি বর্তমানে সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য, আত্মশ্লাঘা এবং গর্ব অনুভব করে। রোজই বাড়িতে 'ভাত দিয়ে যাও' বলে চিৎকার করা বাঙালি কোন মন্ত্রবলে যেন নিমন্ত্রণ বাড়িতে গিয়ে বলে 'দাদা একটু রাইস দেবেন'?

শুধুমাত্র ভাষাগত দিক থেকেই যে বাঙালি এই মানসিক ধারণা পোষণ করে তা নয়, এর সঙ্গে রয়েছে বাঙালি সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, পালা-পার্বণ, পুজো-আচ্চা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সমস্ত কিছুতেই সে আমদানি করেছে এক মিশ্র রুচির মনোভাব। একেবারে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের বিয়ের আমন্ত্রণপত্রে বাংলার পাশাপাশি ইংরাজিতেও লেখা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেখানে নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বাংলা জানেন না বা পড়তে পারেন না এমন কেউ নেই, তাহলে ইংরেজিতে লেখার কারণ কি? আসলে নিমন্ত্রণপত্রে ইংরেজি থাকলে অন্তত মানসিকভাবেও নিজের সামাজিক মর্যাদার বৃদ্ধি ঘটে। বিয়ের অনুষ্ঠানগুলিতে দেখা যায় মেহেন্দি, সংগীত ইত্যাদিও যেমন আছে সেই সঙ্গে বাঙালি গায়ে-হলুদও হচ্ছে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। খাবারের কথা তো বাদ দেওয়াই ভালো। বাঙালি পদ সেখানে একেবারেই অচ্ছুৎ। 'জামাইষষ্ঠীতে' জামাইয়ের কোলে বাটা দিয়ে পঞ্চ-ব্যঞ্জন খাওয়ানো আবার 'করবা চৌথ' এ সারাদিন উপোস থেকে সন্ধ্যেবেলা চাঁদ দেখে জল খাওয়া, এ বোধহয় বর্তমান বাঙালির পক্ষেই সম্ভব। এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে তাতে আপত্তির কি আছে? অন্যের ভাষা এবং সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার মধ্যে তো একটা সার্বজনীনতার পরিচয়ই ফুটে ওঠে। হ্যাঁ, আপত্তির সত্যিই কোন কারণ থাকত না, যদি দেখা যেত যে, বাঙালি পাঞ্জাবি গান শুনে, মারাঠি নাটক দেখে, মালয়ালাম গল্প পড়ে, কিম্বা হিন্দি কবিতা পাঠে (অবশ্যই এগুলির অনুবাদে) তার অবসর যাপনে রত থাকত।

আসলে বাঙালির এই পরভাষা এবং সংস্কৃতি গ্রহণের কোন জুতসই কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ভেস্তি পরিহিত বাঙালি দুর্লভ হলেও ঘাঘরা চোলিতে তার আপত্তি নেই। মটর পনির বা চানা মসলাতে সে আঙুল চাটলেও জোয়ার বা বাজরার রুটি তার সহ্য হয় না। মহা ধূমধামে সে গণেশ চতুর্থী বা ধন-ত্রয়োদশী পালন করলেও চিত্তিরাই বা ওনাম উৎসবে সে মাথা

চুলকায়। ডান্ডি নাচতে তার খুবই ভালো লাগলেও থেপলা তার না-পছন্দ, 'কেম্ ছো' র বাইরে সে আর যেতে পারে না। এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বাঙালি কোনো একটি জাতিগোষ্ঠীকে ভালোবেসে তার ভাষা এবং সংস্কৃতিগত দিকটা গ্রহণ করেছে তা নয়, খাপছাড়া ভাবে কিছুটা নিচ্ছে কিছুটা নিচ্ছে না। এখানে তার আচরণ যেন খানিকটা খামখেয়ালিপূর্ণ। এমনও দেখা যাচ্ছে, যে রীতিনীতিগুলি বাঙালি সমাজে প্রচলিত সেগুলিও সে আবার নতুন করে আমদানি করছে। যেমন বাঙালির গণেশ পুজোর একটি নির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ নববর্ষ বা ১লা বৈশাখ থাকা সত্ত্বেও সে গণেশ চতুর্থীকেও গ্রহণ করেছে। বাঙালির এই গ্রহণ এবং বর্জন যে তার কোন মানসিক চিন্তন-এর ওপর নির্ভর করে তা এক রহস্য।

প্রায়শই শোনা যায় বাঙালি তার ভাষা নিয়ে চর্চা করে না বা গর্ব অনুভব করে না। এতে আপাতদৃষ্টিতে বলার কিছু থাকে না, কারণ সে অধিকার এবং স্বাধীনতা তার আছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে বাঙালি কি তার সংস্কৃতি, রুচি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি কোন কিছু নিয়েই গর্ব অনুভব করে? না, বরঞ্চ তাতে সে লজ্জিতই হয়। মাতৃভাষা চর্চা এবং তার ব্যবহার যদি কোনো জাতির কাছে লজ্জা এবং হীনম্মন্যতার কারণ হয় তবে যারা শুধু বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে একে নিয়েই চর্চা করছেন বা লালন-পালন করছেন তাঁদের কাছে নয়, সম্ভবত সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছেই তা এক বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

যে দেশটির নাম শুনলেই বাঙালির চোখ চক্ চক্ করে ওঠে, মুখটা খুশি খুশি হাসিতে ভরে যায়, যে দেশে শিক্ষা, কর্ম এবং বাসস্থানকেই তার জীবনের পরম মোক্ষ হিসেবে ধরে, সেই আমেরিকার প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা পড়া এবং তা নিয়ে চর্চা করার প্রভূত সুযোগ রয়েছে। অথচ ভাবতে অবাক লাগে আমাদের রাজ্যের সিদ্ধান্ত—বহু সংখ্যক সরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুলকে ইংরেজি মাধ্যমে রূপান্তরিত করা হবে, কারণ বাংলা মাধ্যমে ছাত্রাভাব। বাঙালির ভাষা এবং সংস্কৃতিগত দিকের প্রতি এই বিরূপাত্মক এবং হীন মনোভাব জাতি হিসাবে আমাদের কোথায় পৌঁছে দেবে তা হয়তো সমাজ বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

তবুও..... তবুও আশা জাগে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা' প্রবন্ধে লিখেছেন, '..... লেখা পড়ার কথা দূরে থাক এখন

নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজীতে।.....আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজীর কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। .....আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজীতে পঠিত হইবে। ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজী একে রাজভাষা অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহুবিদ্যার আধার.. কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না..'।

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির ভাষা নিয়ে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। দেড়শ বছর পরে বাঙালি হয়তো ভাষা এবং সংস্কৃতিগত দিক থেকে কিছুটা ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে, কিন্তু বাংলা ভাষা দিব্যি টিকে আছে। সংখ্যায় কম হলেও এখনো বাংলা ভাষার চর্চা বন্ধ হয়নি। তাই আশা জাগে, তাদের হাত ধরেই না হয় বাংলা ভাষা টিকে থাকবে আগামীতে। তাদের জন্যেই না হয় আমরা গর্বিত হব।

শবর সমাজের রূপকার - শবরমাতা মহাশ্বেতা দেবী

— অমরেন্দ্র মহাপাত্র

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা শহরে। তাঁর বাবা ছিলেন 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনাম গ্রহণকারী বিশিষ্ট কবি এবং স্বনামধন্য গদ্যকার মনীশ ঘটক, মা ধরিত্রী দেবী। বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটক ছিলেন মহাশ্বেতা দেবীর কাকা। 'নবান্ন'- খ্যাত, প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর বিবাহ হয়। সাহিত্যিক - সাংবাদিক নবারুণ ভট্টাচার্য তাঁদের একমাত্র সন্তান। মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক ও মানবাধিকার আন্দোলনকর্মী। তার উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল হাজার চুরাশির মা, রুদালি, অরণ্যের অধিকার ইত্যাদি। মহাশ্বেতা দেবী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তীসগড় রাজ্যের আদিবাসী উপজাতিগুলির (বিশেষত লোধা ও শবর উপজাতি) অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার (বাংলায়), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ও র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কারসহ একাধিক সাহিত্য পুরস্কার এবং ভারতের চতুর্থ ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান যথাক্রমে পদ্মশ্রী ও পদ্মবিভূষণ লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ আসামরিক সম্মান বঙ্গবিভূষণে ভূষিত করেছিল। মহাশ্বেতা দেবী ১০০টিরও বেশি উপন্যাস এবং ২০টিরও বেশি ছোটোগল্প সংকলন রচনা করেছেন। তিনি মূলত বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। তবে সেই সব রচনার মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঝাঁসির রানি', ঝাঁসির রানির (লক্ষ্মীবাঈ) জীবনী অবলম্বনে রচিত। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে। এই উপন্যাসটি রচনার আগে তিনি ঝাঁসি অঞ্চলে গিয়ে তার রচনার উপাদান হিসেবে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য ও লোকগীতি সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

১৯৬৪ সালে মহাশ্বেতা দেবী বিজয়গড় কলেজে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কলেজ) শিক্ষকতা শুরু করেন। সেই সময় বিজয়গড় কলেজ ছিল শ্রমিক শ্রেণির ছাত্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই সময় মহাশ্বেতা দেবী একজন সাংবাদিক ও একজন সৃজনশীল লেখক হিসেবেও কাজ চালিয়ে

যান। তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোধা ও শবর উপজাতি, নারী ও দলিতদের নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর প্রসারিত কথাসাহিত্যে তিনি প্রায়শই ক্ষমতাশালী জমিদার, মহাজন ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আধিকারিকদের হাতে উপজাতি ও অস্পৃশ্য সমাজের অকথ্য নির্যাতনের চিত্র অঙ্কণ করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস সম্পর্কে তিনি লিখেছেন 'আমি সর্বদাই বিশ্বাস করি যে, সত্যকারের ইতিহাস সাধারণ মানুষের দ্বারা রচিত হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাধারণ মানুষ যে লোককথা, লোকগীতি, উপকথা ও কিংবদন্তীগুলি বিভিন্ন আকারে বহন করে চলেছে, তার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে আমি ক্রমাগত পরিচিত হয়ে এসেছি। আমার লেখার কারণ ও অনুপ্রেরণা হল সেই মানুষগুলি যাদের পদদলিত করা হয় ও ব্যবহার করা হয়, অথচ যারা হার মানে না। আমার কাছে লেখার উপাদানের অফুরন্ত উৎসটি হল এই আশ্চর্য মহৎ ব্যক্তিরা, এই অত্যাচারিত মানুষগুলি। অন্য কোথাও আমি কাঁচামালের সন্ধান করতে যাব কেন, যখন আমি তাদের জানতে শুরু করেছি? মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার লেখাগুলি আসলে তাদেরই হাতে লেখা'।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে অন্ত্যজ ও আদিবাসীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিস্থাপন করে তিনি একাধিক কালজয়ী সাহিত্য সৃজন করেছেন, যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করেছে সাঁওতালসহ অন্যান্য জনজাতিসমূহ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বাগদি, ডোম, পাখমারা, ওঁরাও, গঞ্জু, মাল, খেড়িয়া, লোধা-শবর প্রভৃতি জনজাতির কথা। মহাশ্বেতা দেবী অন্ত্যজ ও আদিবাসীদের জীবন উপজীব্য করে প্রচুর ছোটোগল্প রচনা করেন। এসব ছোটোগল্প নিয়ে একাধিক গল্পগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্পগ্রন্থ হল শালগিরার ডাকে(১৯৮২), ইটের পরে ইট(১৯৮২), হরিরাম মাহাতো(১৯৮২), সিধু কানুর ডাকে (১৯৮৫) প্রভৃতি। জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি অতিবাহিত করেছেন অন্ত্যজ আদিবাসীদের সঙ্গে। উদ্দিষ্ট জনজাতির ভৌগোলিক পরিবেশ-পরিস্থিতি—অবস্থান, পার্থিব জীবন-যাপন প্রণালী, সুস্পষ্ট জীবনধারা অনুধাবন এবং উপলব্ধিজাত জীবনাভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে তাঁর সৃজনী শিল্পে। সেই কারণে তাঁর একাধিক লেখা হয়ে উঠেছে অন্ত্যজ শ্রেণির ঐতিহাসিক দলিল। ইতিহাসের সমান্তরালে তিনি রচনা করেছেন জনবৃত্ত অন্বেষণের বিকল্প ইতিহাস। আর এই ইতিহাসের ভেতরেই সুপ্ত থাকে সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং তার আনুষঙ্গিক আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, দেশজ জীবন-ব্যবস্থা। বেশিরভাগ

ক্ষেত্রেই তিনি অন্তেবাসীদের সংগ্রামের মানসিক চেতনার বিকাশ ঘটাতেই বিকল্প এক ইতিহাসের উন্মোচন করেছেন। নানাবিধ কারণেই লেখিকা বিশেষভাবে নারীদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্ত্যজ ও আদিবাসী নারীচরিত্রে বহুমুখী প্রতিবাদী স্বর পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সাহিত্যে লালিত নারীসমাজ অনন্যতায় ভাস্বর। বীর্যে, বুদ্ধিতে, সাহসে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে, প্রেমানুভূতি ও প্রেমাকাঙ্ক্ষায় নারীকে স্বমহিম করে দেখার আর্তি বা আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায় মহাশ্বেতা দেবী সৃষ্ট নারী চরিত্র সৃজনে। অবশ্য এসব কিছুর অধিকাংশ সম্ভব হয়েছে তাঁর বহুমুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-ধর্মিতার জন্য। মহাশ্বেতা দেবী একাধারে খ্যাতিমান লেখিকা এবং সংস্কৃতি ও মানবাধিকার কর্মী, যা তাঁর সাহিত্য সম্ভারের বিষয়- বৈচিত্র্যতা এবং পরিপূর্ণতা দান করেছে। অরণ্যচারী জন-জীবন সৃজনে তিনি সাব-অলটার্ন ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছেন। উপজাতিদের বঞ্চনা ও বিভিন্ন সমস্যার কথায় প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রান্তীয় গোষ্ঠীদের পরিবর্তন সাপেক্ষে, ভারতীয় সমাজ- রাজনীতি ভাবনার পরিবর্তিত রূপচিত্র—যা আসলে বিপন্নতার দলিল এবং সাহিত্য রচনার আধারে স্থানীয় ইতিহাস সৃজনের নবোদ্ভূত কৌশল। আখ্যান গ্রন্থনে কেবল সমাজতত্ত্বই উঠে আসেনি, সঙ্গে সঙ্গে পাঠককুল সমাজ মনস্তত্ত্বর সন্ধান পেয়েছেন।

১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতি গঠিত হয়েছিল। গোপীবল্লভ সিং-দেও এই খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৮৩ সালে মহাশ্বেতা দেবী খেড়িয়া শরবদের নিয়ে কাজ করতে পুরুলিয়া আসেন। সেই সময় থেকে প্রশান্ত রক্ষিতও খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন।

মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে গোপীবল্লভ সিং-দেও-এর পরিচয়ের অনুঘটক ছিলেন তৎকালীন পুরুলিয়া কলেজের অধ্যক্ষ সুবোধ বসু রায়। তিনিও সাহিত্যিক আর 'ছত্রাক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দুজনে একসঙ্গে শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছেন। সুবোধবাবুর আহ্বানেই মহাশ্বেতা দেবী পুরুলিয়ায় আসেন খেড়িয়া-শবরদের নিয়ে কাজ করার জন্য।

গোপীবল্লভ সিং-দেও ও প্রশান্ত রক্ষিত দুজনেই পুরুলিয়া কলেজের ছাত্র। গোপীবল্লভ সিং-দেও আগে থেকেই শরবদের নিয়ে কাজ করেছেন এটা সুবোধবাবু জানতেন। মহাশ্বেতা দেবী এর আগেও আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করেছেন, লোধা-শরবদের নিয়ে কাজ করেছেন, ডালটনগঞ্জে (অধুনা ঝাড়খণ্ড) বধূয়া মজদুরদের নিয়ে কাজ করেছেন। এই কারণেই সুবোধবাবু

মহাশ্বেতা দেবীকে পুরুলিয়ায় ডেকেছিলেন। প্রশান্ত রক্ষিতের জন্ম ও শিক্ষা পুরুলিয়া শহরে। ছাত্রাবস্থা থেকেই উনি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সাইকেলে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। তখনই তাঁর গ্রামের সঙ্গে পরিচয়। এছাড়া ওনার ভিতর একটা বেদনা ছিল। পরবর্তীকালে সেটা উনি বুঝতে পেরেছিলেন। আসলে ওনারা জমিদার পরিবার। গ্রামে ওনাদের একটা বাড়ি ছিল। উনি বুঝেছিলেন গরীব মানুষদের পয়সাতেই এই বাড়িটা হয়েছে। এজন্য মনে একটা অপরাধবোধ ছিল। পরে উনি যে দপ্তরে চাকরি করতেন, তাদের কাজও ছিল গ্রামে গ্রামে। গ্রামে ঘোরার ফলে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা একটা বিভীষিকার মতো। খেড়িয়া-শবরদের দেখে ওনার মনে হত ওনাদের কি এই রকম ভালো প্যান্ট-জামা পরার অধিকার আছে? খেড়িয়া-শবররা এত দরিদ্র যে, শীতকালে যখন ওনাদের গলা পর্যন্ত সোয়েটার, ওরা তখন খালি গায়ে আছে।

মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে প্রশান্ত রক্ষিতের পরিচয় ১৯৮৩ সালে। সেই সময় উনি ভারত সরকারের বি.আই.টি.এম-এ পুরুলিয়া শাখায় চাকরি করতেন। প্রশান্ত রক্ষিতের কিন্তু এই চাকরির সঙ্গে ওনার পড়াশোনার বিষয়বস্তু কোনো মিল ছিল না। উনি বি.কম. পাশ করার পর এন.আই.টি. হায়দ্রাবাদ থেকে রুরাল ডেভলেপমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। সেই সময় ভারত সরকারের এই সংস্থা পুরুলিয়ায় তৃণমূল স্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রসারের কাজ করছিল। পরে তারা নানা কারণে এই কাজ বন্ধ করে দেয়। সেই সময় উনি একটি আদিবাসী গ্রামে ম্যালেরিয়া রোগ বিষয়ে একটি প্রদর্শনী নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে মহাশ্বেতা দেবী এসেছিলেন। সেই প্রদর্শনীতে তিনি আদিবাসীদের ভাষাতেই ওদের মত করে কিভাবে ম্যালেরিয়া ও ডায়ারিয়া রোগের প্রতিরোধমূলক সতর্কতা নিতে হয় আর কীভাবে এই দুই রোগ প্রতিরোধ করতে হয় সেটা বোঝাচ্ছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। উনি বললেন - তুমিও আমাদের কাজে ভিড়ে যাও।

মহাশ্বেতা দেবী একজন বিখ্যাত লেখিকা। তাছাড়া তিনি আদিবাসীদের সঙ্গে থাকেন, তাদের সঙ্গে মেশেন। এই কারণে ওঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা ওনার ছিল। সেই সময় খেড়িয়া- শবরদের সংগঠন গড়ার কাজটা চলছিল। মহাশ্বেতা দেবীও এই কাজে পুরুলিয়ায় এসেছিলেন। এরপর উনি মহাশ্বেতা দেবীর ডাকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতির কাজে যোগ দেন।

পুরুলিয়া শহরে প্রশান্তবাবুর শ্বশুরমশাইয়ের প্রেস ছিল। গোপীবল্লভ সিং-দেও নানা কাজে সেখানে আসতেন। ফলে গোপীবল্লভ সিং-দেও-এর সঙ্গে ওনার পরিচয় হয়। প্রথম দিকে গোপীবল্লভ সিং- দেও প্রশান্ত রক্ষিতকে বলতেন, 'তুমি কি পারবে গ্রামে গিয়ে এদের সঙ্গে কাজ করতে?' তখন উনি একদম শিক্ষানবিশের মত ওদের সঙ্গে থেকেছেন। একটা ঘটনা ওনাকে খুব প্রভাবতি করেছিল। একটি বৈঠকে প্রায় দু-আড়াইশো শবর ছিল। উনি দেখলেন গোপীবল্লভ সিং-দেও প্রত্যেকের নাম ধরে কথা বলছেন। মিটিঙের পর প্রশান্ত রক্ষিত জানতে চেয়েছিলেন কীভাবে এতজনের নাম মনে রাখা সম্ভব? গোপীবল্লভ সিং-দেও বলেছিলেন-তুমি ঢুকে যাও, তুমিও পারবে। এখন দেখলেন, সেদিন গোপীবল্লভ সিং-দেও ঠিক কথাই বলেছিলেন সত্যি কথা, এখন উনি দশ-বারো হাজার লোকের নাম জানেন, গ্রাম জানেন। আসলে কাজ করতে গেলে যা হয় আর কি, ত্রিশ বছর ধরে একই জায়গায় কাজ করতে করতে এটা হয়ে গেছে।

প্রশান্ত রক্ষিত সমিতিতে ঢোকার আগে কাজের পরিধি ছিল কম। খেড়িয়া-শবরদের উপর যে অত্যাচার হত গোপীবল্লভ সিং-দেও সেটা লিখে মহাশ্বেতা দেবীকে জানাতেন। মহাশ্বেতা দেবী আবার সেটা পত্রাকারে নানা পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত খেড়িয়া- শবর কল্যাণ সমিতির সংগঠন তৈরির কাজটা চলছিল। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় খেড়িয়া-শবরদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করতেন গোপীবল্লভ সিং-দেও। তখন গোপীবল্লভ সিং-দেও একা এই কাজটা করতেন বলে তাঁকে নান অসুবিধার মুখোমুখি হতে হচ্ছিল। শবরদের উপর অত্যাচার কিন্তু তখনও কমানো যায়নি। এই অত্যাচার কমাতে অনেক সময় প্রায় চল্লিশ বছর লেগেছে। পুলিশ আর সাধারণ মানুষের মানসিকতাটাই তখনও পর্যন্ত পাল্টানো যায়নি। সাধারণ মানুষও শবরদের বুঝত না। ওদের প্রয়োজনটা এতই কম ছিল যে, লোকেরা ভাবত-এই মানুষগুলোর চলছে কি করে? ওদের মানুষ বলেই মনে করত না। ফলে ওদের সম্পর্কে একটা সন্দেহ ছিল। পরে ওদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দেখলেন-এখনও দেখছেন ওদের চাহিদা খুবই কম। সামান্য একবেলার খাওয়া-সেটাও ওদের জোটে না সব সময়।

১৯৬৮ সালের ৭ জানুয়ারি খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতি গঠিত হয়েছিল। গোপীবল্লভ সিং-দেও আর আটজন শবর ছিলেন এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। মহাশ্বেতা দেবী পুরুলিয়ায় এসে যেটা করলেন- ১৯৮৩ সালে পুরুলিয়ার ১নং ব্লকের মালডি গ্রামে প্রথম একটি শবর মেলা হল।

চারিদিকের গ্রামের শবরদের সেই মেলায় আসার জন্য ডাক দেওয়া হয়েছিল। মেদিনীপুর থেকে লোধা-শবররাও এসেছিল। চুনি কোটালও এসেছিল। সেই মেলায় শবরদের একটি কমিটি গঠিত হয়। ঠিক হয়, কমিটিতে কেবল শবররাই থাকবে। মহাশ্বেতা দেবী কার্যকরী সভানেত্রী আর প্রতিষ্ঠাতা হলেন গোপীবল্লভ সিং-দেও আর শবররা। স্বাধীনতা সংগ্রামী লোচু শবর সেই সময় থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন। বর্তমানে জলধর শবর কমিটির সম্পাদক। গোপীবল্লভ সিং-দেও-এর সঙ্গে যে আটজন শবর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তারাও সেই মেলায় ছিলেন।

সেই মেলার মিটিং-এ মহাশ্বেতা দেবী শবরদের কাছে কয়েকটি বিষয়ে আবেদন জানান। তিনি শবরদের সংগঠিত হতে বলেন। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে সচেতন হবার কথা বলেন। বলেন- হেলথ কেয়ার-এ যাও, বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাও। শবরদের মধ্যে মদের নেশাটা খুব বেশি মাত্রায় ছিল। সেটা বন্ধ করার জন্য তিনি আবেদন করেন। বলেন, পুলিশ যে শবরদের সন্দেহ করে, রাস্তাঘাটে ধর-পাকড় করে, মেরে দেয়-সেটাও ওই মদ খাওয়ার জন্য। পুলিশ ও প্রশাসন তখন মহাশ্বেতা দেবীকেও সন্দেহের চোখে দেখত। মেলায় সেই মিটিং-এর সময় চারিধারে পুলিশ ও সি আই ডির লোকেরা ছিল। মহাশ্বেতা দেবী ওদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে দূরে থাকার দরকার নেই, আপনারাও এসে বসুন, আমরা কি গল্প করছি শুনুন।

আসলে এই শবর মেলা হল সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভা—প্রতি বছর নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের শনি ও রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। দিনের বেলা শবরদের কোথায় কি অভাব-অভিযোগ, কী প্রয়োজন-সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। রাত্রিবেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শবররা ভূমিহীন। ওদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার জন্যই শবরদের এই সংগঠনটা তৈরি হয়েছিল। আগে ওরা গোপীবল্লভ সিং-দেও-এর কাছে অভিযোগ করত। শবররা আগে সংঘবদ্ধ ছিল না বলে ওদের উপর জোর-জুলুম, সন্ত্রাস চালানো হত, যখন-তখন পুলিশ ওদের তুলে নিয়ে যেত। গোপীবল্লভ সিং-দেও বলতেন- তোমরা সংঘবদ্ধ নও বলেই উচ্ছেদ হচ্ছ, তোমরা যদি একজোট হও তাহলে কেউ আর তোমাদের তুলতে পারবে না।

মেদিনীপুরের লোধা-শবর আর পুরুলিয়ার খেড়িয়া-শবররা প্রায় একই। তবে টোটেম টাইটেলের দিক থেকে কিছু পার্থক্য আছে। পুরুলিয়া জেলার সকলের টাইটেলই শবর। কিন্তু পশ্চিম মেদিনীপুরে যে সমস্ত লোধা-শবর

বাস করে তাদের শবর, কোটাল, দণ্ডপাট, মণ্ডল ইত্যাদি প্রায় আঠারো-উনিশটা টাইটেল আছে। লোধা-শবর আর খেড়িয়া শবরদের মধ্যে বিবাহ বা অন্য কোন বিষয়ে আদান- প্রদান নেই। অথচ এদের উভয়েরই দেবতা জগন্নাথ। এর তো ইতিহাস আছে।

খেড়িয়া-শবররা পুরুলিয়ার আটটি ব্লকে বাস করে-পুরুলিয়া ১ ব্লক, পুঞ্চু ঘুড়া, মানবাজার ১নং ও ২নং ব্লক, বলরামপুর, বরাবাজার আর বান্দোয়ান। প্রতি বছরই শবরদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে। সাতানব্বইটি প্রশ্ন নিয়ে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে এই চালানো হয়। এটাকে শবরদের বারমাস্যা বলা হয়। এখন শবরদের ৩৪৯০টি পরিবার ১৯৫৬৩ জন শহর পুরুলিয়ায় বাস করেন। পেশাগতভাবে শবররা আগে কৃষিকাজে অভ্যস্ত ছিল না, কিন্তু এখন কিছু কিছু জায়গায় ওরা কৃষিকাজ করছে। এছাড়া ওরা জঙ্গলের শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করে, কিছু শবর দিন-মজুর হিসেবে কাজ করে আর হস্তশিল্প, যেমন-খেজুর পাতা ও বাঁশের কাজ করে। খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতির পক্ষে থেকে একটা নতুন কাজ-গমের ঘড় দিয়ে হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে কাঁচা মালের যোগান থাকতে হবে আর হস্তশিল্পের বাজার থাকতে হবে। হস্তশিল্প বাজারজাত করার দায়িত্ব সংগঠনের। নিয়ম হল- প্রতি মঙ্গলবার শবররা তাদের হস্তশিল্প এনে সমিতিকে দেওয়া। শবরদের প্রাপ্য সমিতি থেকে হাতে হাতে দিয়ে দেওয়া আর কিছুটা ওদের স্বামী স্ত্রীর জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া। মঙ্গলবার হাট বসে বলে ওইদিন টাকা নিয়ে শবররা চাল বা কাপড়-চোপড় কেনে। সমিতির কাছ থেকে এই সমস্ত হস্তশিল্প কলকাতার মঞ্জুসা সহ অন্যান্য সংস্থা কেনে। দিল্লীর একটি সংস্থাও কেনে। এছাড়া সারা বছর ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে হস্তশিল্পের মেলা বসে, যেমন-ক্র্যাফট বাজার, দিল্লিতে দিল্লিহাটে, সূরজগঞ্জে সূরজ মেলা, কাপাড়ে গ্রামশ্রী মেলা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্তশিল্প মেলা ইত্যাদি। কলকাতার হস্তশিল্প মেলায় শবর শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন প্রতি বছর।

আগেই বলেছি শবরদের সমস্যার কথা মহাশ্বেতা দেবীকে লিখে পাঠানো হত, উনি সে-সব নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি করতেন। একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি। তখন অর্চিষ্মান ঘটক ছিলেন পুলিশের ডি.জি.। সেই সময় হঠাৎ ইনল্যান্ড লেটারে হিন্দিতে লেখা একটা চিঠি এল। তাতে লেখা ছিল যে বক্সার জেলে ছজন শবর আটক আছে। বিষয়টি মহাশ্বেতা দেবী অর্চিষ্মান ঘটককে জানালেন। এখানকার ডি.জি. আবার ব্যাপারটা বিহারের ডি.জি. মি. জৈনকে জানালেন। জানা গেল যে, ওদের(১০+১০) ২০ বছরের সাজা

হয়েছে। ওরা নাকি বিহারে কোনো ক্রাইম করেছিল। ওদের বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। পুলিশ ওদের তুলে নিয়ে যায়, তারপর থেকে ওরা নিরুদ্দেশ ছিল। দুটো কেস থাকতে পারে, আইনে কিন্তু একই সঙ্গে সাজা হবে। অন্যায়ভাবে যে ১০ বছর করে দুটো সাজা হয়েছিল, তা হতে পারে না। কিন্তু বিহারে এটা হয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবী অর্চিষ্মান ঘটককে লেখার পর ওই ছজন শবর এক মাসের মধ্যেই ছাড়া পেয়েছিল।

পুরুলিয়াতে শবরদের উপর কোনো অত্যাচার হলেই মহাশ্বেতা দেবী সংবাদপত্রে কলম ধরতেন—বন্ধ কর তোমাদের এই অত্যাচার। বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী তখন পঞ্চায়েত মন্ত্রী। তাঁকে লিখে মহাশ্বেতা দেবী অনেক শবরকে পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। শবরদের উন্নয়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন। এইজন্য সমিতি নানা স্কিম তৈরি করত। মহাশ্বেতা দেবী দিল্লি সহ নানা জায়গায় স্কিমগুলি পাঠিয়ে দিতেন। মহাশ্বেতা দেবীর অনেক শুভানুধ্যায়ী এই প্রকল্পে অর্থ সাহায্য করেছেন। কলকাতায় কোনো অনুষ্ঠানে মহাশ্বেতা দেবীকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি বলতেন— লোধা শবর ও খেড়িয়া শবরদের নামে চেক লেখো। সেই চেক তিনি পুরুলিয়ায় পাঠিয়ে দিতেন। জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের সমস্ত টাকা তিনি খেড়িয়া শবর সমিতিকে দান করেছেন। লোধা শবর ও খেড়িয়া-শবর সমিতিকে তিনি বহু অর্থ সাহায্য করেছেন। তখন তিনি সমিতির কর্মীদের বেতনের জন্য প্রতি মাসে দশ হাজার করে টাকা পাঠাতেন। এখন সমিতির হাতে কোনো প্রকল্প নেই। সেই কারণে অর্থের প্রয়োজন। সমিতির প্রকল্পগুলি লাভজনকভাবে চলে না। যে শিল্পসামগ্রীগুলি বিক্রি হয়, সেই বিক্রিলব্ধ টাকা শবরদের নগদে ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মারফৎ দিয়ে দেওয়া হয়। বিক্রির টাকার কোনো অংশ সমিতি নিজের কাছে রাখে না। ফলে সমিতি আজ পর্যন্ত স্বনির্ভরশীল হয়ে ওঠেনি। কারণ প্রথম থেকেই এটা ঠিক ছিল যে সমিতি একটি অলাভজনক সংস্থা হবে। ফলে কোনোদিনই সমিতি আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে না।

এবার সমিতিকে স্বনির্ভর করে তোলার কথা চিন্তা করা হচ্ছিল। ভাবা হচ্ছে মহাশ্বেতা দেবী যখন থাকবেন না তখন সমিতি কীভাবে চলবে। ভাবা হচ্ছিল কোনো কমার্সিয়াল প্রোডাকশন করার কথা। যেমন—সমিতির নিজস্ব পুকুরে মাছ চাষ করা বা শবরদের তৈরি করা হস্তশিল্প থেকে সামান্য অংশ লাভ হিসেবে নিয়ে সমিতিকে স্বনির্ভর করে তোলা। এ থেকে সমিতির নিজস্ব খরচ, যেমন—বিদ্যুৎ খরচ বা কর্মীদের বেতন—এগুলো মেটানো যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতির দফতর রাজনোয়াগড় পুরুলিয়া শহর থেকে বত্রিশ কিলোমিটার দূরে মানবাজার যাওয়ার পথে পড়ে। এক সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা দেবী বলেছিলেন- রাজনোয়াগড়ই আমাদের বাড়ি, আমার। বছর বছর উনি শবর মেলা সংগঠনের কাজ করেছেন, চাল ডাল সংগ্রহ করেছেন। আগেও তুষার তালুকদার (প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার), অরুণপ্রসাদ মুখার্জী (প্রাক্তন ডি জি) প্রভৃতিকে বলে শবর মেলার জন্য চাল ডাল ইত্যাদি জোগাড় করে দিয়েছেন। ওঁর মাধ্যমে বহু লোকের সঙ্গে খেড়িয়া-শরব সমিতির যোগাযোগ হয়েছে, সেইসব ব্যক্তি সমিতির শুভানুধ্যায়ী হয়েছেন। তাঁরা পুরুলিয়ায় এসেছেন। ফলে শবরদের উপকার হয়েছে। এত ভালো ভালো মানুষ এই সংগঠনে আসার ফলে শবরদের উপর পুলিশের সন্দেহ কিছুটা কমেছে। বলে শবরদের উপর আগে যে অত্যাচার হত, এখন সেই অত্যাচার অনেক কমেছে। একটা ঘটনার কথা বলি - গত ১৪ জুলাই ২০১১ পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার সুনীলকুমার চৌধুরী ৭৮০ জন (২৬২ পরিবার) শবরকে, প্রত্যেককে ৬কেজি চাল, ৬ কেজি আলু আর ধুতি-শাড়ি-লুঙ্গি দিয়েছিলেন। আগে পুলিশ শবরদের দেখলে চোর বলে হাজতে ঢুকিয়ে দিত। এখন চিত্রটা পাল্টে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শবরদের (১২০০ জনকে ৮৩১ একর জমি) পাট্টা দিয়েছিল। কিন্তু সেইসব জমি শবরদের কোনো কাজে আসেনি। কারণ সরকার সব জমির দেয়নি অথবা শবরদের দেখিয়ে দেয়নি। এছাড়া অধিকাংশ জমিই কৃষির অনুপযুক্ত ডুংরি জমি। এক টুকরো জমি এখানে তো আর এক টুকরো জমি আধ কিলোমিটার দূরে। জমিটা এক জায়গায় নয়। কমপক্ষে দশ বিঘা জমি না থাকলে সারা বছর চাষ করে সেই জমি থেকে একজন চাষী লাভবান হতে পারবে না।

আগেই বলেছি শবররা অরণ্যের সন্তান। এরা কৃষিকাজে অভ্যস্ত ছিল না। ব্যবসা করার মানসিকতাও শবরদের মধ্যে নেই। সমিতি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করার ফলে এখন শবরদের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে। শবরদের প্রায় সব শিশুই এখন স্কুলে পড়তে যায়। তবে কাজ এখনও অনেক বাকি। শবরদের মধ্যে অনেকে গ্রাজুয়েট হয়েছে। শবরদের মধ্যে চাকুরিজীবিও আছেন। পশুপতি শবর বলে একজন ল্যান্ড রিফর্মস ডিপার্টমেন্টে চাকরি করত, এখন মারা গেছে। দুজন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করত, তারাও মারা গেছে। পূর্বে পাচজন শবর ছেলে চাকরির সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু তাদের শারীরিক মাপ-জোক কম হয় তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন

জ্যোতি বসু। মহাশ্বেতা দেবী জ্যোতি বসুকে লিখেছিলেন, যাতে মাপ-জোকের ব্যাপারটা উপেক্ষা করে ওই পাঁচজনকে চাকরি দেওয়া হয়। এটা মুখ্যমন্ত্রী করতে পারেন। তারপর কয়েকটি অনুষ্ঠানে জ্যোতি বসুর সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর দেখা হয়েছে। তখনও মহাশ্বেতা দেবী জ্যোতি বসুকে সেই চিঠিটার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তারপর তো তিনি মুখ্যমন্ত্রী থেকে চলে গেলেন, কাজটা আর হয় নি।

বাসস্থানের বিষয়ে শবররা ইন্দিরা আবাসন যোজনার ঘর পেলেও এখনও প্রায় শতকরা ১৫ জন শবর ঝুপড়িতে বাস করে।

মহাশ্বেতা দেবী পুরুলিয়ায় আসার জন্য অনেক কাজ হয়েছে। কমিউনিটি হল তৈরি হয়েছে, স্কুলগুলো চালু হয়েছে, বিভিন্ন হেলথ স্কিম চালু হয়েছে, শবরদের মধ্যে সার্বিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ শবরদের শিশুরা স্কুলে যায়, শবর বাচ্চারা ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামে পোলিও খায়। সেটা সম্ভব হয়েছে সমিতির এতগুলি স্কুলের এতজন শিক্ষক আর সমিতির এতজন কর্মী গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাজ করার ফলে।

হস্তশিল্প মেলায় মহাশ্বেতা দেবী নিজের হাতে যেমন শবরদের হস্তশিল্প বিক্রি করেছেন, তেমনি খেড়িয়া-শবর সমিতির প্রতিটি কাজেই তাঁর ভূমিকা ও অবদান আছে। যেমন, হস্তশিল্প বিক্রির বাজার পাওয়া বা সমিতির জন্য বিভিন্ন প্রজেক্ট পাওয়ার ব্যবস্থা করা, শবরদের এলাকার মধ্যে দশটি কমিউনিটি হল তৈরি করা, কৃষির একটা পূর্ণ বৃত্ত তৈরি করা, ডুংরি জমিগুলিকে কৃষির উপযুক্ত করে তোলা ও সেখানে সেচের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। তিনি কৃষি আধিকারিকদের একটা সমবায় ভিত্তিক প্রজেক্ট তৈরি করার কথা লিখেছিলেন। ম্যাগসাইসাই অ্যাওয়ার্ড ফাউন্ডেশন মহাশ্বেতা দেবীকে দুটি কমিউনিটি হল তৈরি করার জন্য আলাদা করে দশ হাজার ডলার দিয়েছিলেন। ৮টি ব্লকে ইতিমধ্যে ২৬টি কমিউনিটি হল তৈরি হয়েছে।

বেশ কিছু অনুপযুক্ত জমিকে কৃষি উপযুক্ত করে তোলা হয়েছে। শবর চাষীদের কৃষিতে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সমিতি থেকে তিন বছর সার, বীজ ও সেচের ব্যবস্থা করা হয়।

শবরদের আটটি ব্লকে ১০৮টি স্কুল তৈরি করা হয়েছিল শবর শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, এগুলি সবই ছিল নন-ফর্মাল স্কুল। এইসব স্কুলে শবর শিশুদের ক্লাস ফোর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হত। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শবরদের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা যাতে তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের সকরারি স্কুলে পড়াতে পাঠায়। পরবর্তীতে যাতে তার হাই

স্কুলে যেতে পারে। পরে সরকার এখানে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। যাতে ওভারল্যাপিং না হয় সেই কারণে এখন সমিতির স্কুলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সমিতির অনুদানের টাকার এখন চারটি স্কুল চালু আছে। ওই চারটি স্কুলে প্রায় ৪৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে। এক সময় সমিতি শবর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসও তৈরী করেছিল। সেগুলিও এখন বন্ধ আছে। শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য ওই স্কুল ও ছাত্রাবাসগুলি তৈরি করা হয়েছিল। এখন শবররা সরকারি স্কুলে যাচ্ছে। ক্রমশ শবরদের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ বাড়ছে।

স্বাস্থ্য বিষয়ে সমিতির মোবাইল হেলথ স্কিম চালু আছে। বছরে আট-দশবার ডাক্তার ও ওষুধ নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে মোবাইল হেলথ স্কিমে শবরদের চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া সমিতির হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আছেন। তিনি প্রায় তিরিশ বছর ধরে সমিতির রাজনোয়াগড় কার্যালয়ে প্রতি মঙ্গলবার বসেন ও শরবদের চিকিৎসা করেন।

সমিতির আর একটা বড় কাজ হল শবরদের আইনি সহায়তা দেওয়া। শবরদের ক্রিমিনাল ট্রাইব-চোর ডাকাত বলা হয়। পুরুলিয়া কোর্টে পাচজন অ্যাডভোকেট আছেন, তাঁরা শবরদের লিগাল এইড দেন। শবরদের কারো কোনো কেস থাকলে বা জামিন নেওয়ার থাকলে সেগুলি আমাদের উকিলবাবুরা দেখেন। তবে যারা ক্রিমিনাল, যারা অপরাধী, তাদের সমর্থন করা হয় না- যাতে ক্রাইম বন্ধ হয়। কারণ তাদের সাপোর্ট করলে ওরা আবার ক্রাইম করবে। কিন্তু শবরদের উপর পুলিশ অন্যায়ভাবে অত্যাচার করলে সমিতি তাদের লিগাল এইড দিয়ে সাহায্য করে। শবরদের মধ্যে আগে যে হারে অপরাধপ্রবণতা ছিল, তা এখন অনেক কমে গেছে। এ বিষয়ে সমিতি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে শবরদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে চলেছে। ইতিমধ্যেই ওদের সচেতনতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হল পুরো শবর সমাজকে শিক্ষার আলোয় আনা। সকলের জন্য বাড়ি আর পাট্টাপ্রাপ্ত জমিকে সেচ ব্যবস্থা সহ কৃষিকাজের উপযুক্ত করে তোলা। শবর সমাজে সমিতির ভূমিকা দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কের মত নয়। সমিতির লক্ষ্য- শবরদের সচেতন করে দাও, ওদের কি অধিকার আছে সেটা জানিয়ে দাও - তাহলেই ওরা নিজেদের অধিকার আদায় করে নেবে। বাইরে থেকে ওদের জন্য কিছু করে দিলে ওরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

মহাশ্বেতা দেবীকে শবর সমাজ মা বলে। ওঁকে এক অর্থে শবর-মাতাও

বলে চলে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ওঁর কাছে অনেক কিছু পেয়েছি, অনেক কিছু শিখেছি। আমি ওঁকে যদিও বড়মা বলি, কিন্তু উনি আমার মা বাবা সবই। শবর সমাজ যেমন পেয়েছে, আমিও তেমনি ওঁর বিপুল আশীর্বাদ পেয়েছি। কীভাবে সৎ অথচ স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করতে হয় সেটাও আমি ওঁর কাছেই শিখেছি। তাই এখনও মাথা উঁচু করে বেঁচে আছি।

২০১৬ সালের ২৩শে জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মহাশ্বেতা দেবী কলকাতার বেল ভিউ ক্লিনিকে ভর্তি হন। সেই বছরই ২৮শে জুলাই একাধিক অঙ্গ বিকল হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি মধুমেহ, সেপ্টিসেমিয়া ও মূত্র সংক্রমণ রোগেও ভুগছিলেন। চলে গেলেন সেই মহাবৃক্ষ, যাঁর মাথা ছুঁয়েছে আকাশ, শেকড় যাঁর ছড়িয়ে গেছে মাটির গভীরে। জরাগ্রস্ত শরীরের যন্ত্রণা দীর্ঘদিন বুকে নিয়ে ২৮শে জুলাই ২০১৬ সালে সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী শবরমাতা মহাশ্বেতাদেবীর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

তিনি চেয়েছিলেন মৃত্যুর পর রাজনোয়াগড়ের মাটিতে যেন তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়। সেই মাটিতে একটা মহুল গাছ পোঁতা থাকবে। গাছটি সবাইকে ছায়া বাতাস দেবে।

তাঁর সেই ইচ্ছাকে সম্মান জানাতে মৃত্যুর ঠিক এক মাস পরে কেন্দা থানার রাজনোয়াগড় গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ শবর-খেড়িয়া কল্যাণ সমিতির অফিস চত্বরে মহাশ্বেতাদেবীর অস্থিভস্ম সমাহিত করা হল। আর সেই মাটিতে পুঁতে দেওয়া হল একটি মহুল গাছ। শবর-খেড়িয়াদের কারও মা, কারও বা শুধুই দিদি মহাশ্বেতাদেবী পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামের মাটিতে এ ভাবেই কোল পেলেন। তাঁর স্মরণসভায় তাঁকে ঘিরে নানা অকথিত তথ্যও উঠে এল। তাতে তিনি প্রখ্যাত লেখিকা মহাশ্বেতা নন, নিতান্ত আটপৌরে পরিবারেরই একজন। যাঁকে শবর সমিতির সদস্যেরা নিজেদের বাড়ির লোক ভেবে এসেছেন। দারিদ্র্য-অপুষ্টি অশিক্ষার বেড়ায় আবদ্ধ শবরদের মুক্তির গান শুনিয়েছিলেন। তাই তিনি শবরদের এত আপন হতে পেরেছিলেন।

স্মরণসভা হচ্ছে জেনে ছুটে এসেছেন, তাঁর এক সময়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তখনকার রাজ্য পুলিশের ডিজি (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) অনিল কুমার। এ দিনের স্মরণসভায় জেলার নানা প্রান্তের শবর খেড়িয়ারা তো বটেই, হাজির ছিলেন জেলার তখনকার দুই মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো, সন্ধ্যারানি টুডু, সাংসদ মৃগাঙ্ক মাহাতো প্রমুখ। শেষ বয়সে তাঁর চিকিৎসা করতেন কলকাতার বাসিন্দা মৌলী মুখোপাধ্যায়। ওইদিন তিনি কয়েকজন সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে লাল শালুতে মোড়া অস্থিভস্ম কলকাতা থেকে নিয়ে আসেন। বোরো গ্রামের

বাসিন্দা বিনোদ শবর বলেন, ''একবার রাজনোয়াগড়ের শবর মেলায় খেতে বসেছি। দেখি মহাশ্বেতাদিও বসে গিয়েছেন। আমি পাতায় কিছুটা খিচুড়ি রেখে উঠে যাচ্ছিলাম। তিনি আমায় হাত ধরে টেনে বসালেন। খাবার নষ্ট করা চলবে না।'' আবার মানবাজার থানার জনড়া গ্রামের উর্মিলা শবর তাঁকে অন্য ভাবে পেয়েছেন। তিনি বলেন, ''সে বার আমার এক বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মেলায় এসেছিলাম। আসার পর থেকে ধুম জ্বর। এক কোণে চুপ করে বসেছিলাম। ওঁনার চোখ এড়ায়নি। সব শুনে নিজেই আমার ছেলের কপালে জলপটি দিতে বসে গেলেন। পরে ডাক্তার এসে দেখে ওষুধ দিলেন। সব তাঁরই নির্দেশে হয়েছে। শুনেছি ওঁর খুব নাম ডাক ছিল। কিন্তু আমরা সে সব বুঝতে পারিনি। আমাদের সঙ্গে তিনি সহজ ভাবেই মিশতেন।''

তাঁর অনুপ্রেরণায় সমিতির অধীনে শবর বালিকাদের ছাত্রী আবাস গড়ে উঠেছিল। পুরুলিয়ার কয়েকটি ব্লক এলাকায় শবর শিশুদের শিক্ষা সম্প্রসারণে ১০৮টি স্কুল খোলা হয়েছিল। কোথাও কোথাও শবর যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে হাতের কাজ শেখানো, কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর মতো একগুচ্ছ প্রকল্প চালু হয়েছিল। অর্থের জোগান কমে আসায় ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর প্রশান্ত রক্ষিতের বক্তৃতায় তাই আক্ষেপ ঝরে পড়ে। পুরুলিয়ার তৎকালীন পুলিশ সুপার রূপেশ কুমার অবশ্য আশ্বাস দিয়েছিলেন, শবর শিশুদের পড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে।

এই সমিতি গড়ার পিছনে একটা ইতিহাস রয়েছে। রাজনোয়াগড় রাজ পরিবারের সদস্য গোপীবল্লভ সিংহদেও তখন স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক। স্থানীয় শবররা তাঁর কাছে ছুটে এসে জানান, পুলিশ ও প্রশাসন নানা ভাবে শবর-খেড়িয়াদের উপর নির্যাতন করছে। গোপীবল্লভ সিংহদেও প্রথম শবরদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝালেন। ১৯৬৮ সালের ৭ জানুয়ারি মানবাজার ব্লকের কুদা গ্রামে প্রথম শবর সম্মেলন হয়। শবরদের সমাজের মূল স্রোতে আনার আন্দোলনের সেই শুরু। এরপরেই যোগাযোগ হয় মহাশ্বেতাদেবীর সঙ্গে। ১৯৮৩ সালের ১২ নভেম্বর কেন্দা ব্লকের থানার মালডি গ্রামের শবর মেলায় মহাশ্বেতাদেবী যুক্ত হন।

সেই সভাতেই তাকে 'শবর জননী' আখ্যা দেন গোপীবল্লভ সিংহদেও এবং সকল শবরবৃন্দ। সমিতির কার্যকরী সভানেত্রী করা হয় তাঁকে এবং আমৃত্যু অবধি তিনিই কার্যকরী সভানেত্রী ছিলেন। সেই থেকে রাজনোয়াগড়ের সাথে মহাশ্বেতার যোগাযোগ আমৃত্যু। মৃত্যুর পরেও তিনি এই মাটিতেই রয়ে গেলেন।

আমার ভাষা

— ইতি ঘোষ
দশম শ্রেণি, রাইগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়

এই ভাষাতে
কথা শিখেছি
ডেকেছি প্রথম মা
এই ভাষাতে
শ্বাস নেওয়া মোর
আমার প্রথম স্বপ্ন দেখা।
এই ভাষাতে
অক্ষর লেখা
এই ভাষাতে বাক্য
এই ভাষাতে গড়েছি মোরা
মানবতার ঐক্য।
এই ভাষাতে সূর্য ওঠে
পাখিরা গায় গান,
এই ভাষাতে বৃষ্টি পড়ে
বায়ু বেগমান
এই ভাষাতে শিশু ওঠে
খিলখিলিয়ে হেসে
এই ভাষাতে
নদীর জলে
রাজহংসী ভাসে।
এই ভাষাতে গড়েছিল মা
আন্দোলনের ঘাঁটি
বীর শহীদের
রক্তে ভেজা
আজও বাংলার মাটি
কত নক্ষত্রের
জন্ম দিয়েছো
ধন্য তুমি মা
জগৎ মাঝে উচ্চ শির
মোদের বাংলা ভাষা
বাংলা মোদের মাতৃভাষা
বাংলা মোদের গৌরব
বিশ্ব মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক
এই ভাষার গৌরব।
মানবো না কভু
শুনবো না কভু
তোমার অপমান।
যুগে যুগে
ধরে রাখবো মোরা
এই বাংলা ভাষার গান।

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ ঃ একটি কূট প্রশ্ন

—সজল রায়চৌধুরী

আসলে উদ্বেগযুক্ত থাকলেই ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কেউ তো ইংরেজি, চিনা, জাপানি বা কোরিয়ান ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন না। জনজাতিদের ভাষা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কারণ ইংরেজি, চিনা এসব ভাষা বিপন্ন নয়। অন্যদিকে জনজাতিদের ভাষাগুলো এমন বিপন্ন যে প্রতি ১৫ দিনে গড়ে একটা করে ভাষা লুপ্ত হচ্ছে। অর্থাৎ সেই ভাষার শেষ কথকের মৃত্যু হচ্ছে।

বাংলা ভাষার বাচকের সংখ্যা প্রায় তিরিশ কোটি। পৃথিবীতে পঞ্চম বা ষষ্ঠ অবস্থানে আছে বাঙালির মাতৃভাষা। ১৭ কোটি জনসংখ্যার একটি রাষ্ট্র ও আছে যার ৯৪ শতাংশ বাচক বাংলাভাষী। সে দেশের রাষ্ট্রভাষাও বাংলা।

এত কিছু সত্ত্বেও বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে চাপা এবং স্পষ্ট উদ্বেগ কেন ?

হ্যাঁ, উদ্বেগের কারণ আছে। কারণটা বুঝতে গেলে ভাষার প্রয়োগক্ষেত্র (domain) ব্যাপারটা বুঝতে হবে। ভাষার প্রয়োগ হয় (১) কথা বলায়, (২) শিক্ষায়, (৩) প্রশাসনিক কাজে, (৪) আইন আদালতে এবং (৫) ডিজিটাল বা সাইবার ক্ষেত্রে। এছাড়া সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রটিও আছে।

ভাষার বিপদ প্রথমত আসে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে বাচক সংখ্যা হ্রাস পেলে। তরুণ প্রজন্ম যদি মাতৃভাষা সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে অন্য কোনো প্রভাবশালী ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাকে বলা হয় ভাষা সরণ। এভাবে মাতৃভাষার স্বচ্ছন্দ বাচকের সংখ্যা কমতে থাকে।

ইংরেজি ও হিন্দির দিকে শহুরে উচ্চমধ্যবিত্ত তরুণদের মধ্যে ভাষা সরণের লক্ষণ দেখা গেলেও তা এখন ও বিপন্নতার চেহারা নেয়নি। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দির খিচুড়ি পাকিয়ে যা বলা হয় তাকে বুলি মিশ্রণ বলা হয়। এতে বিপদের সঙ্কেত পাওয়া যায়, বিপন্নতা নয়।

বাংলা ভাষার বিপন্নতা অন্য সব ক্ষেত্রেই প্রতিদিন গভীর হচ্ছে।

শিক্ষায় মাতৃভাষা

শিক্ষার স্বাভাবিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম মাতৃভাষা। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। ১৯৫৩ সালে ইউনেস্কো এ বিষয়ে ভাষা ও শিক্ষা বিজ্ঞানীদের গবেষণা প্রসূত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে, "The use of vernacular languages in education." সেখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সর্বস্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য বাঙালির কাছে আবেদন জানিয়ে গেছেন। তাঁর একটি তীব্র আকুতির দিকে তাকিয়ে দেখা যাক।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হ ইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক, সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায় ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতায় শূদ্র? তাঁর কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হ ইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম ল ইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হ ই?

যারা বাংলা জানে, ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এত বড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?' (শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ)

এই নির্মমতা প্রতিদিন বাড়ছে। শিশু পাঠশালা থেকে বাংলা ভোলানোর ব্যায়াম শুরু হয়। ইংরেজি মাধ্যমের কৌলীন্য ও বাংলা মাধ্যমের মানহীনতার মধ্যে হাঁ-করা গহ্বরটা প্রতিদিন চ ওড়া হচ্ছে।

প্রশাসন ও বিচারালয়ে বাংলা

এই দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাংলা অত্যন্ত অবহেলিত। পশ্চিমবঙ্গে অন্য অনেক রাজ্য থেকে দেরিতে ১৯৬১ সালের ১১ নভেম্বর সরকারি ভাষা আইন গেজেটভুক্ত হয়। বলা হয় ১৯৬৩ সাল থেকেই বাংলা ভাষায় সব প্রশাসনিক কাজ শুরু হবে।

হল না। বিপরীতে ১৯৬৪ সালে একটি বিজ্ঞপ্তি বেরোল তাতে লেখা হল,

"For all official purposes of the state of West Bengal for which it was being used immediately before that day."

(The West Bengal Code–2nd Edition–vol–7/Act 19 of 1964–Sec–2)

এখানে "it was being used" মানে ইংরেজি যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল । অর্থাৎ আইন পাশের আগে ইংরেজি যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল সব প্রশাসনিক কাজে সেভাবেই ব্যবহার করা হবে।

১৯৭৭ সালে রাজনীতিতে পালা বদল হল নতুন সরকার একটি চমৎকার ভাষনীতির 'ঘোষণা' করল।

"শিক্ষাকে যদি পোশাক বা আভরণ হিসেবে না দেখে বিদ্যারূপ শক্তি হিসেবে দেখা যায়, শিক্ষাকে যদি সমাজের এক বিশেষ অংশকে বৃহত্তর সমাজ থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা ও বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক নিদর্শন হিসেবে না দেখা হয় এবং শিক্ষাকে কেবলমাত্র সুবিধাভোগী শ্রেণির কুক্ষিগত,আয়ত্তাধীন করে

রাখার চিন্তা না করে যদি সমাজের সকল স্তরের, বিশেষ করে শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ভাবা যায়, তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাবে মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে আগ্রহী।"
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গণমুখী শিক্ষা ও ভাষানীতি/পৃ-১০/তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।)

এই যথার্থ নীতি থেকে পিছু হটতে হটতে এই সরকার ও পুনর্মূষিকে পরিণত হল। কী শিক্ষায়, কী প্রশাসনিক কাজে বাংলা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে বঞ্চিততর হয়ে পড়ল।

বর্তমান সরকার স্কুল শিক্ষায় ও বাংলাকে ক্রমাগত ইংরেজি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে চলেছে।

নতুন ক্ষেত্র ও গণমাধ্যমে বাংলার স্থান বেতার, দূরদর্শন, আন্তর্জালের মতো ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার স্থান খুব নগণ্য। পৃথিবীর সাইবার ক্ষেত্রে চিনা, ইংরেজির স্থান সবচেয়ে বেশি। ফরাসি, জাপানি, আরবি জনসংখ্যা অনুপাতে যথাযথ স্থানে আছে। কোরিয়ান ভাষার মোট বাচক মাত্র ৭কোটি হলেও সাইবার ক্ষেত্রে তারা ২% জায়গা দখল করে আছে।
অথচ ১৪০ কোটি বাচকের ভারতীয় সব ভাষা মিলেও ১ শতাংশে পৌঁছোয়নি সাইবার ক্ষেত্রে স্থান। বাংলার কথা বলাই বাহুল্য।

দেখা যাচ্ছে আধুনিক জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাংলা একটা অতি সঙ্কুচিত স্থানে বিচরণ করছে।
বাঙালি নিজের ভাষা নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগছে ।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে বাংলাভাষার ভবিষ্যতের কথা।

করণীয় কী ?

খুঁটিনাটি পরিকল্পনা তো পরের কথা। কাজটা সংক্ষেপে, বাংলা ভাষার প্রয়োগক্ষেত্র তিলে তিলে প্রসারিত করা।
তার ও গোড়ার প্রশ্ন, নিজের অন্তরে দৃষ্টি চালিয়ে নিজেদের প্রশ্ন করি, আমরা সত্যিই কি জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রসার চাই ?

চাইলে বাংলা ভাষাকে মারে কে ?
আর ভাবের ঘরে চুরি করে বছরের একটি দিনে ভাষা দিবস পালন করলে এ ভাষার তিলে তিলে মরণ ঠেকাবে কে ?

আমার ভাষা

—আর্যদীপ দাস
মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, ২০২৩
মালদা উমেশ চন্দ্র বাস্তুহারা উচ্চ বিদ্যালয়।

সবার কাছে ভীষণ প্রিয়
নিজের মাতৃভাষা,
নেই তো তাতে দ্বন্দ্ব-দ্বিধা
আছে ভালোবাসা।

আমার ভাষা মিষ্টি ভাষা
নেই পোশাকী বহর,
এরজন্যই বরকতরা
শহীদ হয়েও অমর।

রবি, মধু, নজরুলরা
যতন করে সেটি,
বুঝিয়ে গেছেন সারা বিশ্বে
শ্রেষ্ঠ ভাষা এটি।

বর্তমানে ব্যস্ত সবাই
ফিরিঙ্গিদের নিয়ে,
জেনে রেখো এ'সব বাহার
যাবেই দ্রুত ধুয়ে।

সব ভাষাকেই কদর করতে
আমরা সবাই জানি,
বাঙলা ভাষা তাইতো আজি
সকল ভাষার রাণী।

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ

— উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবিষ্যৎ বললে কেমন একটা অন্ধকার দেখা দেয়। শব্দটা গোলমেলে। অনিশ্চিত শূন্যতাই তো ভবিষ্যৎ। তবু ছোটোবেলা থেকেই গুরুজনদের মুখে ঐ শব্দটার বহুল ব্যবহার শুনে এসেছি। রেগে গেলে—তার কিস্‌সু হবে না। ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অথবা কাউকে আশীর্বাদ বা শুভেচ্ছা জানাতে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক। দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করো। এই হল ভবিষ্যৎ শব্দের ব্যবহারিক স্বভাব। হতাশ্বাসে তা অন্ধকার। আশাবাদে তা উজ্জ্বল।

ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? ধাপ্পাবাজিগুলো তো কেবল দুর্বল মানুষের। নড়বড়ে মনকে একটু অনুপ্রাণিত করতে মাদুলি, তাবিজ কবচ, জলপড়া, ফুল বাতাসা অথবা ধাতুর অলংকার। কার্যত এও এক পেশা। প্রতি মুহূর্তে যেখানে অনিশ্চিত সেখানে অঙ্ক কষে ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া অসম্ভব। তবু আশায় বাঁচে চাষা। বাঁচে কি? মরে—কেবলই মরে। ভবিষ্যতের বিপদ কীভাবে কী রূপে আসবে না জেনে সেই সম্ভাব্যকে অনুকূল করার চেষ্টা মূর্খামি। তবে যে প্রসঙ্গে এই গৌরচন্দ্রিকা—সেক্ষেত্রে যে চেষ্টা একটা ন্যূনতম উজ্জ্বলতা জাগাতে পারে বলে মনে করি। প্রসঙ্গটা ভাষার। বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ।

প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি আসা যাওয়ার শিয়রে শিয়রে একজাতীয় আবেগ উচ্ছ্বাসের প্লাবন আসে। কখনও কখনও তার বাহ্যিক আড়ম্বর চোখ ধাঁধাঁয়, কিন্তু ভেতরের অন্ধকার বাড়ায়। একটা গান, দুটো কবিতা, এক মিনিট নীরবতা, কিছু ফুল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা, ভাষা শহীদদের স্মৃতিতর্পণ—ব্যাস। উদ্‌যাপন আর পালন—একটা দিনের। তাতে ভাষার সংরক্ষণ শুশ্রূষা, সঞ্চালন হয় কি? এ একটা বড়ো বিষয়। যা রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত তাকে একদিনের আনুষ্ঠানিকতায় মহিমময় করে ফেলা যায়—ফলশ্রুতি শূন্য। অনেকটা ঐ ব্যস্ততার কারণে প্রিয়জনের খোঁজ নিতে অপারগ সন্তানের নার্সিং হোমের অসুস্থ মায়ের শিয়রে বসে কপালে হাত বোলানোর মতন। অসুস্থ মানুষের জন্যে ফল, মিষ্টি, ফুল কোনও কাজ করে না। সেটা আনন্দ দেয় বটে, তাতে উপশম হয় না। সমস্যাটা হচ্ছে এটাই

আমরা পারি। এটাই আমরা করে থাকি। মুমূর্ষু রোগীর জন্যে প্রয়োজন জীবনদায়ী ওষুধ।

আমাদের বাংলা ভাষাপ্রীতি তাই একদিনের একটা উচ্ছ্বাস। 'আমি বাঙালি, আমার মাতৃভাষা বাংলা'—বাঙালি হিসবে আমি গর্বিত বলে সোসাল মিডিয়ায় ছবি পোস্টালে বাংলা ভাষা সংস্কৃতি ও জাতির ভিত্তি খুব শক্তিশালী হয় না। বেনোজলের ঢেউ আর মরা গাঙে জীবনের জোয়ার আসা এক কথা নয়। আবেগতাড়িত হয়ে পড়া সহজ—তাকে সযত্ন লালন পালন সহজ নয়। প্রায় অসম্ভবও বলা যায়। লোক দেখানো সম্পর্ক কখনও আত্মিক হতে পারে না।

আর একটা কথা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষাকেই আদর্শ কর রেখেছে। ভাবের ভাষ্য বাংলা তাই কাজের জগতে অপাংক্তেয়। মগজে ঢুকে গেছে বীজমন্ত্র। বাংলা পড়ে কী হবে? ও তো প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনও ভূমিকাই নিতে পারবে না। তাই ঐ উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ওটা থাক—মর্যাদা নাকি। আসল গুরুত্ব ঐ ইংরাজিটা। কর্পোরেট দুনিয়া ও আন্তর্জাতিক বাজারে ওর চাহিদা অনেক। তাই বাংলার পরিস্থিতি কেবল কাগজে কলমে আবেগে উচ্ছ্বাসে। বাস্তবিক সেটা রক্তে প্রবাহিত কোনও অপরিহার্যতা নয়।

অথচ অস্তিত্বের গভীরে যে শিকড়—সেখানে তার উপেক্ষার বেদনা দীর্ঘশ্বাস হয়ে নিঃশব্দে চলেছে। অন্তর্লীন সে বেদনা। কেন এসব কথা উঠছে? কই? কিছু তো ঘটেনি। সবই তো ঠিকঠাক আছে। না—তেমন আর কী-ই বা ঘটেছে? সবই তো যথাযথ। কেবল...।

ঐ কেবল নিয়েই দু'চার কথা। সোসাল মিডিয়ায় বাংলার চর্চার ছড়াছড়ি। সে বাংলার বিরামচিহ্নের কোনও বালাই নেই। কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি, বিস্ময়, জিজ্ঞাসার মা বাপ নেই। কোথায় 'ও' কার, কোথায় 'ই' কার তার ঠিকঠাক নেই। কি, কী-এর কোনও তফাৎ নেই। যার যেটা ইচ্ছা। অবাধ স্বাধীনতা। দাঁড়ি যেখানে সেখানে। কীভাবে, কিভাবে, কীনা, কিনা ইত্যাদির জগাখিচুড়ি। হল আর হলো—নিয়ে চূড়ান্ত বিভ্রান্তি। শব্দ ব্যবহারের সাযুজ্য নেই। চোখে দেখা, কানে শোনা ও উপভোগ করার পথে বিস্তর বাধা। ক্রিয়া, সর্বনাম, ক্রিয়া বিশেষণ, অনুসর্গের জোট বলে কিছু

নেই। উদ্দেশ্য বিধেয় যেমন আমাদের জীবনেও নেই—তেমনই ভাষাতেও নেই। বচন, লিঙ্গ, পুরুষ সম্পর্কে ধারণা আছে। আমাদের যা .....না। ইদানীং দেখা যাচ্ছে উনি হয়ে যাচ্ছে উনার। আর খুব বিস্ময় বোঝাতে!!! তিনবার বিস্ময় চিহ্ন। আর শেষের দাঁড়ি দুবার।। সৌজন্যতা, উৎকর্ষতা, সহযোগিতা, সখ্যতা চলছে এখনও।

প্রশ্ন উঠবে—ক্ষতি কী হয়েছে? মনের ভাব তো প্রকাশ পাচ্ছে। বুঝতে তো কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। এত রক্ষণশীলতা ভালো নয়। ঠিক। সঙ্গে এটাও মানছি তাহলে যে ভাষা সন্ত্রাস বলে মাঝে মধ্যে যে জিগির তোলা হয়ে থাকে—সেটাও কিছু নয়। বাংলা ভাষা তো চূড়ান্ত ভাবেই নমনীয়। তাই সব ভাষাকেই সে আত্তীকরণে অভ্যস্ত। মানছি। তবে একটা কথাও থাকে। ভাষার শৃঙ্খলা থাকা দরকার। যার যা খুশি তেমন করে ব্যবহার করলে চলে না। সংহতি নষ্ট হয়—ব্যাকরণের বাঁধন ভেঙে যায়। আমরা যাকে গাঠনিক চেহারা বলি—তাতে ব্যাঘাত ঘটে। সংস্কৃতের আগ্রাসন থেকে ব্যাকরণকে মুক্ত করার দায়িত্ব সাধারণের হতে পারে না। সে কাজ ভাষা বিশারদদের। বানানের সমতা, বাক্য গঠনের সমতার প্রতি মান্যতা দেওয়াও প্রয়োজন। সব বিষয়ে গা-জোয়ারি ভাবটা ক্ষতিকর। আর সাহিত্যরস বাদ দিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের যে এম.সি.কিউ আর এস.এ.কিউ-এর ভাষা শিক্ষা—সেটা কাম্য পদ্ধতি নয়। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে একটু গুরুত্ব দিয়ে ভাবনাচিন্তা করা দরকার। একদিকে ভাষা। অন্যদিকে সাহিত্য। এই দুইয়েরই উৎকর্ষ বাড়াতে হবে। ছোটবেলা থেকেই সহজ সরল ভাবে শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষার ব্যবহার শেখাতে হবে। সেজন্যে তাকে নিজে নিজে তার চর্চায় গুরুত্ব দিতে হবে। বড়রা লিখে দেবে আর ছোটরা মুখস্থ করবে —এমনটা হলে চলবে না। পারিবারিক শিক্ষা থেকে এর শুরু হবে। তারপর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আসবে ধাপে ধাপে। পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে মাতৃভাষা শিখে শিক্ষার্থী নিজের বোধবুদ্ধি মতো লিখবে। লিখবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়বে। আমরা যাকে রিডিং পড়া বলি। তারপর তার কল্পনাশক্তি ও বাস্তবের জ্ঞান বাড়াতে সাহায্যকারী বই তার হাতে তুলে দিতে হবে। তো সেক্ষেত্রে সিলেবাসের মস্ত বড়ো ভূমিকাটি সেখানে

অস্বীকার করলে চলবে না। লিখতে পড়তে ও বলতে পারার ক্ষেত্রে নিয়মিত অনুশীলন প্রয়োজন। সময় সারণীতে গল্প বলা ও গল্প শোনা ও গল্প পাঠের অবকাশ থাকবে। তারই ভেতর দিয়ে সে সঠিক বানন, বাক্যগঠন, মনের ভাব প্রকাশের যোগ্যতা অর্জন করবে। বাংলা ভাষায় রচিত ক্লাসিক সাহিত্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। সেজন্য বিষয় গ্রন্থাগার থাকতে হবে। শিক্ষার্থীকে অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হবে। মৌলিক চিন্তা বিকশিত করার জন্যে সহায়ক বিষয় ভাবনায় তাদের চালিত করতে হবে। মাসে একটা অন্তত ওয়ার্কশপ রাখতে হবে। সেমিনারের ব্যবস্থা করতে হবে। ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় অংশ নেবে। তাৎক্ষণিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে হবে।

সবথেকে বড়ো কথা—শ্রদ্ধা চলে গেছে। আর মাথায় ঢুকে গেছে যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোনও বাণিজ্যিক মূল্য নেই। না থাক। তবু নিজের ভাষা জানতে হয়। যেমন মাকে জানতে হয়। বাবাকে জানতে হয়। জন্মভূমিকে জানতে হয়। প্রতিযোগিতা বা শিক্ষাক্রমের পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করে কেন বলতে হয়—আমার সাফল্যের পেছনে... সহায়কপাঠগুলি সাহায্য করেছে?

আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা ও মাতৃভাষা চর্চা

——সৌমেন রায়

সমস্যা দার্শনিক হোক বা বস্তুগত, আনন্দে আত্মহারা হই বা দুঃখে ম্রিয়মাণ, আমরা যাঁর শরণাপন্ন হই সেই গুরুদেব স্বয়ং বলে গেছেন শিক্ষার ভাষা কি হওয়া উচিত। 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ।' যদিও অতীতে বক্তব্যের এই খণ্ডিত অংশটির অপব্যবহার করা হয়েছে। তাও মূল সুরটি সর্বদা অপরিবর্তনীয়। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে কথাটি একটু বেশি রকমের সত্যি। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যাঁর নাম স্বয়ং আইনস্টাইনের সঙ্গে উচ্চারিত হয় তাঁরও একটি বিখ্যাত উক্তি । যাঁরা বলেন বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা করা যায় না, হয় তাঁরা বিজ্ঞান বোঝেন না বা বাংলা জানেন না।' শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ভাষা যে মাতৃভাষা হওয়া উচিত সেই ব্যাপারে সওয়াল করে গেছেন আমাদের আরো দুই আচার্য, জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। এরপর আর বলার অবকাশ থাকে না যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করা যায় এবং তা করা উচিত।

তবে আমরা যদি ভারি ভারি বক্তব্যকে সরিয়ে রাখি তাও সাধারণ বোধ বুদ্ধি থেকেও আমরা বলতে পারি যে শিশু অবস্থায় পড়ার মাধ্যম অবশ্যই হওয়া উচিত মাতৃভাষা। তার কারণ একটি শিশু যদি ভাষা নিয়েই ব্যস্ত থাকে, ভাষা বুঝতেই তার অর্ধেক সময় এবং শক্তি ব্যয় হয় তাহলে সে বিষয় বুঝবে কি করে। তাই বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে বিজ্ঞান শিক্ষা তথা সমগ্র শিক্ষার মাধ্যম অন্তত উচ্চ প্রাথমিক পর্যন্ত হওয়া উচিত মাতৃভাষা। যে ভাষায় সে দৈনন্দিন কথা বলে, আনন্দ ও দুঃখ প্রকাশ করে সেই ভাষা। এই বয়সে অনেকখানি সময় কল্পলোকে বিরাজ করে শিশু কিশোররা। এই গল্পলোক বা কল্পলোক অনেক অভিভাবকের কাছে চিন্তার বিষয় হলেও ভবিষ্যতে এই কল্পলোক কিন্তু পড়াশোনাতেও সাহায্য করে। যে কোন উচ্চস্তরের গবেষণা, আবিষ্কার নির্ভর করে কল্পনাশক্তির ওপর। ভেবে দেখুন মানুষ ভাবতে পেরেছিল পাখির মত ডানা মেলে উড়বে, তাই কিন্তু আবিষ্কার হয়েছিল এরোপ্লেন। উচ্চস্তরের বিজ্ঞান প্রায় পুরোটাই বিমূর্ত ভাবনা, তাই কল্পনাশক্তি পড়ার অপরিহার্য অঙ্গ। আর বিষয়ের ভাষা বুঝতে শিশুকে যদি প্রবল কষ্ট করতে হয় তাহলে দুমড়ে যায় তার সেই কল্পলোকটি। অসাধারণ মেধাবী শিশু, যে অনায়াস দক্ষতায় অর্জন করে ফেলে আরও একটি ভাষা তার কথা আলাদা।

বিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যা কী এক কথায় তা বলা খুবই মুশকিল। আসলে

সমস্যা বিবিধ, তার মধ্যে অন্যতম ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবল অনীহা, যার অন্যতম কারণ উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব। মৌলিক বিজ্ঞান পড়ার ক্ষেত্রে সেটি তো ভীষণভাবে প্রকট। গোটা ছাত্র জীবন ধরে প্রবল অনিশ্চয়তা তাদের। তবে সে প্রসঙ্গ ভিন্ন। বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম বাধা হলো ভাষা, আমাদের আলোচনা সেই বিষয়ে। প্রকৃত সমস্যা ভাষা না পরিভাষা? অনেকেই পরিভাষাই প্রধান সমস্যা বলে মনে করেন। মনে করেন সঠিক পরিভাষার অভাবেই সঠিক বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু ভিন্নমতও আছে, আর তা হলো পরিভাষা প্রধান সমস্যা নয়। মাধ্যমিক স্তর, এমনকি উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা যথেষ্ট শক্তিশালী। প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিক টার্মের উপযুক্ত পরিভাষা আমাদের আছে। অল্প কিছু পরিভাষা যা নেই সেগুলিতে ছেলেমেয়েরা অভ্যস্ত। জোর করে পরিভাষা তৈরির প্রয়োজন নেই। সেটা চেয়ারকে কেদারা বলার মতো হয়ে যাবে। পরিভাষার অভাব আছে উচ্চস্তরে। তবে সেখানেও জোর করে পরিভাষা তৈরির কোন মানে হয় না। তার কারণ আমরা ইউরোপীয় দেশগুলির মত বিজ্ঞানে স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। উচ্চতর গবেষণার জন্য যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের ছেলেমেয়েদের রাজ্যের বাইরে, দেশের বাইরে যেতেই হয়। তাই সময় থাকতে ইংরেজি ভাষাটি রপ্ত করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। জার্মানিতে যেমন জার্মান ভাষাতেই উচ্চ স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান পড়া হয়। কারণ তারা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট গবেষণার সুযোগ দিতে পারে এবং গবেষণা শেষে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে পারে। আমাদের তা সম্ভব নয়। তাই ইংরেজি ভাষাটা আমাদের শিখে নিতেই হয়, এমনকি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক স্তর থেকে ইংরেজি পরিভাষাটিও বাংলার সাথে সাথে বুঝে নেওয়া উচিত।

পরিভাষা যদি থেকেই থাকে তাহলে ভাষা নিয়ে সমস্যা কোথায়? এখানে তো মাতৃভাষা বাংলাতেই পড়াশোনা করা হয়। হ্যাঁ, এটা ঠিক বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিতে বাংলাতেই পড়াশোনা করা হয়। কিন্তু সেই বইয়ের বাংলা ভাষা আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য ভাষার সঙ্গে মেলেনা। একে তো তাদের জীবন বহির্ভূত বেশ কিছু জিনিস শিখতে হয় সঙ্গত কারণেই। তার ওপর আবার সে যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষায় বই লেখা হয় না। তার ফলে ব্যাপারটা গ্রহণ করতেই তাদের সমস্যা হয়। সাবলীলভাবে রপ্ত করতে না পারার জন্য ভারা মনের সমস্ত বাতায়ন বন্ধ করে মুখস্থ করে। ফলে দ্রুত তা

মুছে যাচ্ছে মন থেকে, মৌলিক ভাবনাও বিকশিত করা দুষ্কর হয়ে উঠে। আবার ইদানিংকালে নম্বর-কেন্দ্রিক পড়া দৃষ্টিকটুভাবে বেড়ে গেছে। চাহিদা পূরণ করতে, প্রাথমিক স্তর থেকে স্কুলের সময় বাদে বাকি সময়ের সিংহভাগ অংশ টিউশন ছোটাছুটি করে ছাত্রছাত্রীরা। ফলত তার হাতে অবসর বলে কিছু থাকে না। 'অপচয় করার মতো সময় না পাওয়ায় পাঠ্য বই ছাড়া অন্য বই পড়বে কখন? গল্পবই পড়া কমে গেছে বলা ঠিক নয় আসলে ওটা কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি এসে ঠেকেছে। ফলে একটি ছাত্র বা ছাত্রীর ভাষার ওপর দখল অত্যন্ত হতাশাজনক। তারা সাধারণ বাংলারও মানে বোঝে না, ফলে বিজ্ঞান পড়ানো ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছে। একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। ধরা যাক, আর্কিমিডিসের নীতি পড়ানো হচ্ছে। সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষক বললেন 'অপসারিত তরলের ওজন', এখন এই 'অপসারিত' শব্দটির মানে সে জানে না। উত্তল লেন্স পড়াতে গিয়ে যদি বলা হয় যে 'অভিসারি রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হচ্ছে', সে অভিসারী মানে জানেনা। বিজ্ঞান ক্লাসে টুকটাক এসব মানে বলে দেওয়া যায়। কিন্তু যদি অনেক শব্দেরই মানে বলে দিতে হয় তাহলে আসলে সেটা হয়ে ওঠে ভাষাশিক্ষার ক্লাস। তখন সে সরে আসে বিজ্ঞান বোঝা থেকে। তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে ভাষাটি বোঝার জন্য। বোঝাই যাচ্ছে বিজ্ঞানের পরিভাষা আর ইংরেজির মধ্যে কোনো তফাৎ নেই তাদের কাছে। কোনো ছাত্র- ছাত্রী যদি গড় গড় করে বাংলা রিডিং পড়তে না পারে তাহলে প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান কেন, তার কোনো শিক্ষাই সম্ভব নয়। আর সেটা করতে গেলে পাঠ্য বহির্ভূত পড়াও দরকার। এই সহজ কথাটি অনেক শিক্ষিত অভিভাবকও মানতে চান না। তারা ছেলেমেয়েদের পাঠ্য বহির্ভূত বিষয় পড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সমস্যাটা যে শুধু বিজ্ঞানে তাই নয় কিন্তু । এই সমস্যা সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্র প্রযোজ্য।

সমস্যা তো বোঝা গেল, তাহলে সমাধান কি? সমাধান খুবই সোজা এবং সকলেই তা জানেন। আর সেই কারণেই মনে হয় সমাধান অধরা থেকে যায়। সমাধানটা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে ভাষাশিক্ষার উপর জোর দেওয়া। তাত্বিকভাবে হয়তো সেটা দেওয়াও হয়। কিন্তু বাস্তব? অন্তত উচ্চ প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ছেলেদের সিলেবাসের বোঝা যদি প্রয়োজন হয় তা কমিয়ে পাঠ্য বহির্ভূত মাতৃভাষার চর্চা বাড়ানো উচিত। এ সবই ভাষিকভাবে ভাবা হয়, কিন্তু বাস্তবে প্রযুক্ত হয়না। প্রতিবার বিস্তর আলাপ-আলোচনার পর সিলেবাস কমার বদলে বেড়ে যায়। ভাষা শিক্ষা নিয়ে বাংলা শিক্ষকরা বলছেন তাঁদের

এখন নাকি প্রতি ক্লাসে ত্রিশটা মতো করে গদ্য পদ্য পড়াতে হয়। তাহলে তিনি একটা প্রান্তিক ছেলে পড়তে পারে কি না, লিখে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে কি না সেটা দেখার সময় পাবেন কোথায়? কথাটা অস্বীকার করার মত নয়। কাগজে কলমে স্কুলে কর্মদিবস বেড়েছে, বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সার্বিকভাবে উন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু নিবিড় পাঠের সময় গেছে কমে। সমাধানের উপায় জানা নেই।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা করলে বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশ ঘটে সহজে এটা সহজ সত্য। তাই মাতৃভাষার চর্চার বিকল্প কিছু নেই। মাতৃভাষার চর্চা যেভাবেই হোক বাড়াতেই হবে। কীভাবে তা করা যাবে সেটা সর্বস্তরে ভাবা উচিত বলে মনে হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি—'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর প্রাক্কালে কিছু কথা

—বিকাশ চন্দ্র আড়ি

বন্ধুগণ,

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা ঠিক করবে প্রশাসন। রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা প্রশাসনকে বিব্রত করার লক্ষ্যে ছাত্রসমাজকে ব্যবহার করছে। এসব কোন মতেই বরদাস্ত করা হবে না। আমরা আমাদের রাষ্ট্রে বিশ্বাসঘাতক ঘরোয়া শত্রুদের সহ্য করব না—এই বলে ১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ ঢাকার রেসকোর্সে ময়দানের জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশের বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিকে নস্যাৎ করেছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার এই চক্রান্ত ধরে ফেলেছিল ভাষাপ্রেমী বাংলাদেশ এর বাঙালীরা। তাই ১৯৫২ সালে শুধু ঢাকা নয় পর্বূবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত হতে শুরু করে। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের কর্মসূচিতে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্থির হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২ সাল) সারা বাংলায় পালিত হবে সাধারণ ধর্মঘট। উর্দু নয় বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ)-এর একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ভাষা নিয়ে এই আন্দোলনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য জায়গায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি অদম্য টানে মিছিলের পর মিছিল বের হয়। প্রশাসনের গুলিতে রক্তাক্ত হয় মিছিল। মিছিলে থাকা বহু ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়। মৃত্যুমিছিল কিন্তু থামেনি। ভাষার জন্য আবেগময় এই আন্দোলনে কতজন যে শহীদ হয়েছিলেন তার প্রকৃত সত্যিটা আজও অজানা। তবে বাংলা ভাষার জন্য এই আহূতি ব্যর্থ হয়নি। ১৯৭১ সালের পর পূর্ব পাকিস্তান হয় বাংলাদেশ আর রাষ্ট্রভাষা হয় বাংলা। ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে প্রস্তাব রাখা হয় ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করতে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর প্যারিস সম্মেলনে জাতিসংঘের মহাসচিব ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘের প্রতিটি দেশ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে

মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙা ২১শে ফেব্রুয়ারি পেল স্বীকৃতি। চেতনার রঙে রঙিন হল ২১শে ফেব্রুয়ারী। বাংলা ধ্বনিতে কেঁপে উঠেছিল নীলাকাশ। জনমদুখিনি মায়ের (ভাষামাতৃকা) গ্লানি মোছাতে পথে নেমেছিল লাখো সন্তান। কিন্তু ২০২৩ এর ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রাক্‌মুহূর্তে আমরা কি লক্ষ্যে স্থির, না লক্ষ্যভ্রষ্ট!

আজও আমাদের গর্বের বাংলা ভাষা কর্মের ভাষা হয়ে ওঠেনি। শুধুমাত্র প্রভাতফেরি, টিভি-নাট্যে, রেডিয়ো অনুষ্ঠানে, ফেসবুক গ্রুপে আর শহীদ ভাইদের বেদীতে মাল্যদানেই শেষ ২১শে ফেব্রুয়ারী। ভাষাকে যদি আমরা প্রাঞ্জল করতে চাই তাহলে ভাষার মধ্যেও একটা প্রাণ আছে, একটা গতি আছে এটা ভাবতে হবে। সে শ্বাসপ্রশ্বাস চায়। নানা অছিলায় বহতা নদীর মত পথ বদলে এগিয়ে যেতে চায়। এই অভীপ্সার পূর্ণতা মানে ভাষার ক্রমবিকাশের পথ তৈরি হওয়া, আমরা চাই সর্বত্র একটা ঝকঝকে স্বাস্থ্যবান ভাষা থাকবে হাটে-মাঠে-হৃদয়ে যার অভিব্যক্তি হবে সরকারি অফিসে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, মুদির দোকানের খাতায়, ছুটির আবেদনে কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমপত্রে। স্কুল-কলেজ, ট্রেন-বাস-ট্রাম সর্বত্র ভাষার সুস্বাস্থ্য নিয়ে মাথা ঘামাবে সবাই। দেশ-কাল ভেদে ভাষা সাহিত্যের বনস্পতিরা তাদের লেখনিতে অপরিহার্যতা বজায় রাখবেন, দৈনিক সংবাদপত্রের সেনানীরা ক্ষুরধার করবে মাতৃভাষাকে তাদের কলমের শলাকায়। তবেই অনন্তযৌবনা এই ভাষা হবে দেশকাল ভেদে এক অপরূপা রাজকন্যে। ভাষা নিয়ে ভালোবাসা যেন নির্দিষ্ট কারণে হরমোন ক্ষরণের মত না হয়, তাই ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা দিবসে আমাদের ভাষা তর্পণ হোক এই বলে—

> ''মোদের গরব মোদের আশা
> আ-মরি বাংলা ভাষা।
> ... ...
> ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকনু মায়ে 'মা' 'মা' বলে;
> ঐ ভাষাতেই বলবো হরি, সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা।''

সাক্ষাৎকার

‘একুশে’ হল মাতৃভাষা আগলে রাখার দিন

এ কেবলমাত্র একটি দিনের উৎসব নয়। প্রতি দিনের, প্রতিটি মানুষের। দেখতে হবে আমাদের মেরুদণ্ড যেন না বেঁকে যায়, আর কলমের নিবে যেন শ্যাওলা না জমে। প্রতিটি শব্দ সৃষ্টি ও তার সুরক্ষা প্রসবযন্ত্রণাসুখের সমতুল্য । বলছিলেন **অধ্যাপক শুভময় দাস**। শুনেছেন **নায়ীমুল হক**।

ভাষাদিবস নিয়ে সম্প্রতিক এতো হৈ চৈ এর কারণ কি ?

আসলে একুশে ফেব্রুয়ারি কুম্ভীরাশ্রুর দিন। একুশের রাত পেরোলেই ‘হিংরেজির’ দখলদারি মেনে নেবার দিন। এদিন গুটিকয়েক মাতব্বরের মাতামাতি আর নিজেদের জাহির করার উদ্যোগবাসনা লগ্ন। ওখানে ভালোবাসা প্রগৌণ। না থাকে আন্তরিকতা, না দায়বদ্ধতা। ওই একদিনই আমরা কিছু বলি মাত্র, প্রযোগ করি না কিছুই—কোনদিনই। ফলে বাংলাতে কলকাতা থাকলেও কলকাতায় বাংলা থাকে না।

অথচ ‘একুশে উদযাপন’ আমাদের ভালোবাসার উৎসবে ফেরা আর লড়াই জারি রেখে জিতে আসা। একুশ দুঃখের, বিজয়ের প্রাপ্তির বুক ভরিয়ে তোলার আবার কোল খালি করারও। এ দিনটা কান্নার যন্ত্রণার আবার বল্গাহীন আনন্দের অলৌকিক ভোরও বটে। সব ভাষাভাষী মানুষ তার মাতৃভাষা বিষয়ে উৎসাহিত হবেন—ভাববেন, বুক দিয়ে আগলে শ্রদ্ধাশীল হবেন - মর্যাদা রক্ষা করবেন—বাঁচাবার অঙ্গীকার করবেন—এটাই তো উদ্দেশ্য। ভাষা আগ্রাসন নয়, ‘একুশে’ হলো ভাষার আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ। প্রতিটি মাতৃভাষার প্রতি বিশ্বজনীন বোধসঞ্চারই হলো একুশের দায়ভার। প্রতি নাগরিকের কাছে মাতৃভাষা তাদের প্রাণের আরাম। তাই একুশ এক শপথের ভোর ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য বিশেষভাবে আপনার কাছে কি কিছু আছে?

আমি বিজ্ঞানকর্মী-পরিবেশকর্মী। জীববৈচিত্র্য বাঁচানো নিয়ে আমার গবেষণা। পরিবেশ তার স্বরবিন্যাস হারালে যেমনি জীব-বৈচিত্র্য হারায়, খাদ্যজাল খাদ্যশৃঙ্খল রুগ্ন দুর্বল এবং অবলুপ্ত হয়, তেমনি সমস্ত মানুষের মুখে

যদি ভাষার 'ইউনিফর্ম' পরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বৈচিত্র্যের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়। যেখানে ভাষা পোশাক সংস্কৃতি খাদ্য রীতিনীতি ধর্মপ্রতিটি ক্ষেত্রে বৈচিত্র বজায় থাকে সেখানেই সমাজ বিবর্তনের দ্বার খোলে-টেকসই আর স্থিতিশীল উন্নয়ন হয়। প্রতিটা মাতৃভাষা সুস্থ থাকলে দেশের আর্থসামাজিক পরিবেশ সংস্কৃতিও সুস্থ স্বাভাবিক থাকে।।

একজন বাঙালি হিসেবে বাঙালির জীবনে আন্তর্জাতিক তিনটি স্মরণীয় দিন কি আপনার কাছে?

বাঙালি হিসেবে আমার কাছে যদি তিনটি দিন বাছতে বলেন তাহলে (এক) রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ১৯১৩ সালের ১৩ ই নভেম্বর, (দুই) ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, (তিন) ১৯৬১ সালের ২৯মে শিলচর ভাষা দিবস বাঙালী হিসেবে গর্ব করার, শিহরণ জাগানোর, উঠে দাঁড়ানোর আর বুকের মধ্যে হু হু কান্না আনন্দের স্রোতের ভোর ।

ভাষা দিবসের ভাবনার গোড়ায় গণ্ডগোলটা ঠিক কোথায় ?

সবাই ভাবেন ভাষা দিবস কেবলমাত্র একটি দিনের উৎসব, কিংবা সাহিত্যিক উপন্যাসিক নাট্যকারের কবিতা উপন্যাস সৃষ্টিতে ভাষার বাঁচামরা। এখানেই গোড়ায় গলদ। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই ভাষা কর্মী। বাস কন্ডাক্টর দোকানদার, সহযাত্রী যাত্রাশিল্পী, পালাকার, কর্মী, কুলি, মজুর, ধোপা নাপিত, আড়তদার, মৌলবী- মাঝিমাল্লা, হাওলাদার থেকে হকার, বিজ্ঞান বিপণন বিজ্ঞাপনকর্মী, বেশ্যা, দালাল, টিকিধারী পুরোহিত, রাজনীতির ব্যবসাদার, নির্মাণকর্মী—প্রতিটি পেশার প্রতিটি আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক স্তরের মানুষই ভাষাকর্মী। সবার হাতেই রয়েছে বাঁচিয়ে রাখার রিমোট। ভাটিয়ালি, আলকাপ, গম্ভীরা, যাত্রা আটচালার আড্ডায় ভাষার মরণ-বাঁচন। বিজ্ঞান পড়লে সে দায়িত্ব আরো বেশি করে এসে পড়ে। পারিভাষা তৈরি ও তার প্রচলনের দায় তো নিতেই হয়। গবেষণাগার থেকে সুফলকে মাটির কাছে পৌঁছে দিতে হয় এই ভাষাকেই। ভাষা সৈনিক হিসেবে ভাষার সঙ্গে বিজ্ঞান বাঁচাতে হয়। মানুষের কথ্য ও লেখ্য ভাষা দুটোই একে অন্যের পরিপূরক। উচ্চারণ যখন হরফের শরীর পায় তখনই ভাষা শরীর নিয়ে বেঁচে থাকে ।

জিহ্বায় আর তিন আঙ্গুলের জোরেই ভাষার স্থায়িত্ব। ভাষা অক্ষরকর্মীর কাছে বর্ণমালার প্রতিটি শব্দসৃষ্টি ও সুরক্ষা প্রসবযন্ত্রনাসুখের সমতুল্য। প্রতিটি মানুষই প্রকৃত ভাষাসৈনিক আর ভাষাপ্রহরী হতে পারেন। ভাষা বাঁচাবার জন্য নাট্যকার সাহিত্যিক না হলেও চলবে। শুধু বুকে ভালোবাসা নিয়ে শিরদাঁড়া সোজা রেখে সঠিক উচ্চারণই অনেকক্ষেত্রে যথেষ্ট। বিগত পঞ্চাশ বছরে বিজ্ঞানের কত উন্নতি তো হলো, কত শব্দ এলো, কিন্তু জুতসই বাংলা পরিভাষা তৈরি হল না একটাও। এ ভারি আক্ষেপের। কোনো পরিকল্পনা নেই। কম্পিউটার ইলেকট্রনিক্স জগতে নতুন পারিভাষা সৃষ্টি হলো না। সমস্ত স্তব্ধ হয়ে আছে। শপিং মল যদিওবা অনিবার্য কিন্তু শব্দটা, কি সত্যি অনিবার্য? 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' যেমন 'টেকসই উন্নয়ন হয়েছে, তারপর আর তেমনটি আর একটাও শব্দ বিগতদিনে হলো না। হালে 'জ' এর নিচে ফুটকি সংস্কৃতির পথ সুগম করছে কেউকেউ। বাংলা ৫২ বর্ণমালা পরিবারের সদস্য সংখ্যা তাহলে কি বাড়ছে?

বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ এ কি বাংলা ভাষার ক্ষতির আশঙ্কা আছে?

না, না। ভাষা তো বহতা নদীও নিজের খেয়ালে চলুক। শব্দ আসুক গ্রহণ- বর্জনের ভেতর দিয়ে টিকে থাকুক। কিন্তু আগ্রাসী হিন্দি জোর করে চাপিয়ে বাংলা বাক্যের যে নিজস্ব গঠন কাঠামো তা কিন্তু ছারখার করে দিচ্ছে 'কেন কি' 'হিন্দি আমাদেরও রাষ্ট্রভাষা' ভাষার ভিতটাকে নড়বড়ে করে দিচ্ছে! কেন কি এ বড় অনুতাপের। বেনিয়ারা কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপনে হিন্দি কাঠামোয় ভুল বাংলা কিংবা সরাসরি হিন্দি বসিয়ে বাংলার গোড়া আলগা করে দিচ্ছে। সিনেমায় টাকা বাঁচানোর জন্য ঠিক মতো ডাবিং না করে ঠোঁট মেলাবার সস্তা প্রয়াসে হিন্দি শব্দ এবং বাক্য বসাচ্ছে সুচতুরভাবে। এ হলো ভাষা সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার। বাংলা শব্দের অপমৃত্যু হচ্ছে আর নাব্যতাও কমছে অতি দ্রুত।

হিন্দি আগ্রাসনের সম্পর্কে কিছু বলবেন?

নিশ্চয়ই। ভারতবর্ষে এই যাবত সাতশোর মত ভাষা বেঁচে আছে। হিন্দি আমাদের 'রাষ্ট্রভাষা' নয় - সরকারি যোগাযোগের কাজ চালানোর ভাষা। অথচ সবার গায়ে হিন্দির ইউনিফর্ম পরানোর আগ্রাসী চেষ্টা চলছে।

গোবলয়ের হিন্দি আগ্রাসন রুখতে হবে। ভোট বড় বালাই। নচেৎ কবেই ভারতের সমস্ত ভাষাকে গিলে ফেলত হিন্দি। দীর্ঘদিন ধাপ্পাবাজি করে হিন্দিকে কাজ চালানোর ভাষা না বলে 'রাষ্ট্রভাষা' বলে মিথ্যাচার করে এসেছে এরা। এরা একটাই ধর্ম রাখতে চায়। একটাই দল, একটাই ভাষা, একটাই সংস্কৃতি, একটাই খাদ্য পোশাক উৎসব উপাস্য, একটাই নদী—করবার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে বহুদিন। কিন্তু পারবে না যদি আমাদের মেরুদণ্ড না বেচি আর কলমের নিবে আমরা শ্যাওলা না জমিয়ে ফেলি ।এরা ভাষা নদীকে বাঁধ দিয়ে জলাধারে পরিণত করার ধান্দায় আজও মত্ত। আমাদের পৃথক পৃথক সত্তাকে একটি ভাষা ও সংস্কৃতি দিয়ে আপাদমস্তক মুড়ে অন্যকে মুড়িয়ে দিতে চাইছে। ভাষা সাম্রাজ্যবাদ অতি ভয়ানক। সর্বভুক উট। লতা ফুল পাতা ডালপালা শেকড় সমস্ত গলধঃকরণ করবে। এদের কাছে নিয়ম-নীতি শালীনতা সৌন্দর্য সবই অর্থহীন। এরা প্রত্যেকেই এক একটা ভাষা উপভাষা হাঙ্গর আর ভাষা-বর্গী। ভোটের মরশুমে 'বিদিয়াসাগরজী'র অষ্টধাতুর মূর্তি বসাবে আর হৃদয়ের মূর্তি ভেঙে চুরমার করবে। 'বর্ণপরিচয়' এর বিন্দুমাত্র পরিচয় না জেনেও শুধুমাত্র ভোট কিনতে রবীন্দ্রনাথ টেগর আউড়ে কিছুমাত্র রাবীন্দ্রিক ধারা না বুঝে 'চোলায় চোলায় ভোটের' 'ভেরি' বাজিয়ে এ গ্রহবাসীকে সপাটে হিন্দি শুনতে বাধ্য করবে এ ভোট বসন্তে। দিনান্তে বিশ্বভারতীর স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটে। অমর্ত্য অভিজিতকে অপমান করে বাঙালি অস্মিতার গলা টিপে শ্বাসরোধ করবে প্রতিদিন। আমরা হিন্দি ছায়ায় নাচছি 'কেন কি হিন্দি আমাদের' রাষ্ট্রভাষা (!)। বাংলা বলতে তো মাল্টিপ্লেক্সে বিকৃত বাংলা উচ্চারণে 'জনগণমনা' বলে বাংলা ভাষার শ্রাদ্ধবাসরে দেশপ্রেমের তৃপ্তির ঢেকুর তোলা।

ব্যক্তিজীবনে আপনি কিভাবে প্রয়োগ করেন ভাষা দিবসকে ?

আমার কাছে ৩৬৫ দিনই একুশে ফেব্রুয়ারি। প্রতিদিনই কিছু না কিছু সৃজনমূলক লেখা লিখি—সে কবিতা গল্প প্রবন্ধ যাই হোক না কেন। চাকরির দৈনিক হাজিরা খাতায়, ব্যাংকের চেকে, অফিস-আদালতে, সভা-সমিতিতে ইংরেজিতে স্বাক্ষর করিনি। আজও, মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত বিজ্ঞপ্তি বাংলায় জারি করি, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান আলোচনা বক্তৃতামালায় সমস্ত বক্তা বাংলায়

বলেন প্রাণের আনন্দে আলোচনা করেন, বাংলা বর্ণমালায় আন্তর্জাতিক পুস্তিকা প্রকাশ করি, ডাকবাক্সে বাড়ির দরজার নামফলকে বাংলা হরফ থাকে, বিজ্ঞান পাঠদানে বাংলার প্রাধান্য থাকে, প্রচুর বাংলা পরিভাষা তৈরির চেষ্টা করি, বাংলা নাম না থাকা ফুল প্রজাপতি পাখির বাংলা নামকরণের চেষ্টা করি। যে কোনো আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকলে 'বাংলায় বলব' এই একটাই শর্ত থাকে। আজও 'পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন' এর প্রত্যেকটা স্লাইড বাংলায় করি।

আপনি তো কলকাতায় মানুষ নন, জেলার মানুষ, জেলার আঞ্চলিক **উচ্চারণের জন্য হীনম্মন্যতার শিকার হন ?**

'আপনার বাড়ি তো মুর্শিদাবাদে- আর আপনার তো রামনগর তাই না?' উল্টো দিকের চমক আর চোখ চকচকে ভালোবাসা আমায় আপ্লুত করে। কোনটা বাগরি আর কোনটা সালার - সুতি, কোনটা কান্দি ফারাক্কা ক্যানিং দীঘা বোঝা যায় মানুষকে ভালবাসলে। রক, রাস্তায় রেলস্টেশন, টারমিনাসে, নির্মীয়মান ফ্ল্যাটে, রাজমিস্ত্রির হাসিমশকরায় আমি কান পাতি। আমি শুনি তাদের অনায়াস অনাবিল আরাম আর আনন্দ তাঁদের মায়ের ভাষায়। নৈকট্য অনুভব হয়। মনে হয় ওঁদের সঙ্গে আলাপে জিজ্ঞেস করি 'হ্যাঁ গো, কোন গাঁয়ে বাড়ি তোমার'। সব মিলেমিশে যায় তাদের স্বাতন্ত্র । আমার ধোপদুরস্ত টালিগঞ্জের বাবুগিরি চাপা পড়ে যায়। মনের ভেতর পান বরজের গন্ধ ধানক্ষেতের আর পাট যাঁক দেওয়ার মন কেমন করা গন্ধ। এরই নাম বুঝি একুশে। আমার একুশ হলো মায়ের জলপট্টির ছোঁয়া আর মায়ের শাড়ির ঘামের গন্ধ। আমার মেদিনীপুরের উচ্চারণে হীনম্মন্যতা নয় অহংকার সৃষ্টি হয়।

ভাষা দিবসে কি কি পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে ?

সীমান্ত দেশ রক্ষায় যেমন প্রতিরক্ষা সেনানী থাকে ভাষার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ভাষাসৈনিক চাই পাড়ায় ক্লাবে বাড়িতে বিদ্যালয়ে অফিসে ট্রেনে দূরদর্শনে সমাজমাধ্যমে সর্বত্রই। ভাষাকর্মী আর ভাষাপ্রহরীই ভাষা হাঙরের সাম্রাজ্যবাদী থাবা থেকে বাঁচাবে। আমি চাইব প্রত্যেকে বাংলায় স্বাক্ষর করুন ইংরেজিতে নয়, প্রতিটি নাগরিক জীবনে অন্তত একটি করে বই লিখুন যে কোনো বিষয়ে। রোজনামচা রাজনীতি সাহিত্য বিজ্ঞান, প্রত্যেকদিন কিছু না কিছু বাংলায় লিখুন। ডাইরির মত করে মন যা চায়। নিজস্ব ইতিহাস লেখা হোক শুরু করুন মাতৃভাষায় ।

সামাজিক মাধ্যমের আলোচনা ইংরেজি ভাষায় কিংবা 'ইংরেজি হরফে বাংলা' কখনোই কাম্য নয়। বাংলা হরফে লেখা বাধ্যতামূলক হোক। বিজ্ঞাপনী ভাষায় শুদ্ধ বাংলা আবশ্যিক হোক, সাইনবোর্ডে বাহান্ন বর্ণমালাই থাকুক, সব্বার মুঠোফোনে বাংলা একাডেমির অভিধান থাকুক বাংলা বানানের সন্দেহ নিরসনের জন্যে। স্থানীয় কথ্য ভাষায় লেখা কাব্য হোক, পাড়ায় ক্লাবে বিদ্যালয়ে বাংলা বানানের প্রতিযোগিতা হোক, প্রবাদ প্রবচন -এর ব্যবহার বাড়ুক, প্রত্যেকটি সভা- সমিতির সমস্ত আলোচনা ভয়েস টাইপিং-এর মাধ্যমে তার লিখিত ইতিহাস রচনা হোক। প্রতিটি নদীর মন্দিরের রাস্তার ব্যক্তির এবং প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস লেখা হোক স্থানীয় ভাষায়। দশ মিনিট বিশুদ্ধ বাংলায় বিদেশি শব্দ বর্জন করে কথা বলার প্রতিযোগিতা হোক, বাংলা কিবোর্ড আরো সহজ হোক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের নাম বাধ্যতামূলক বাংলায় হোক, বাংলায় বিজ্ঞান ম্যাগাজিন এবং সাময়িকী হোক, বিজ্ঞানে নতুন নতুন পরিভাষার জন্ম হোক, মাতৃভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখা হোক, নিজেদের ছেলেমেয়েদের নামে সুন্দর সুন্দর বাংলা ভাষার স্পর্শ থাক, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের নামে মাটির ছোঁয়া থাক। প্রতি দুই মাসে ভারতবর্ষ থেকে একটা করে ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলা আমাদের আবেগ অহংকার আর অস্মিতা। ভাষা হাঙর এর হাত থেকে রক্ষা করব আমরা এটাই একুশের শপথ। তবেই হয়তো আমরা বলতে পারব। 'বাংলা আমার তৃষ্ণার জল তৃপ্ত শেষ চুমুক' অথবা কবীর সুমনের ভাষায় বলতে পারব—' আমি চাই সাঁওতাল তার ভাষায় বলবে রাষ্ট্রপুঞ্জে'।

आत्म कथा/सबकी कथा

दीपश्री दास सरकार

यू तो कहने को सब कुछ है मेरे पास
फरि भी अधूरा सा लगता है क्यू ...
यह जदिगी तुजसे शकियत तो नही
फरि भी कुछ ख्वाब अधूरा सा रह जाता है कयि,
हजारो तमन्ना होते हुए भी
कोई एक के लएि दलि तरसता है कयि!
यू तो चाहने वाला हजारो है
फरिभी जो इश्क मुकम्मल नही
हो पाई वो हमेशा याद आते है कयि !
घूमते है आंजन शहरो में,
पक्की दीवारो में रहते है कच्चे रश्ते,
हजारो के भीड़ में अकेलापन फरिभि
सताती है कयि!
यू तो खालसि खारजि कएि हमने बहुतो के
पर कसी एक के लएि वो खालसि
जख्म कयि बन जाता है दोस्त...
जदिगी के दौड़ में मलि तो बहुतो से
बछिड़ भी गए सक्रो से ...
फरिभी कसी एक से बछिड़ ने का दर्द
दलिो में लएि फरिते है उम्र भर कयि!
माना की जाना तो सब को ही है,
यहां हर कोई दो दनिका मुसाफरि है,
कफन से दफन तक,
राजद्वार से समशान तक,
जो शक्श साथ दे हमारा...
वो हमसफर के खोज में
कट रही है बाकी बचे
जदिगी मेरा।

আমার ভাষা

— আয়ান চ্যাটার্জী
একাদশ শ্রেণি,
বারাসাত মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়

আমার ভাষা এই বাংলায়
আমার ভাষা শিলাইদহে
আমার ভাষা বীরসিংহে
আমার ভাষা নৈহাটিতে
আমার ভাষা শান্তিনিকেতনে
সেখানে একলা কোপাই বহে।

আমার ভাষা পঁচিশে বৈশাখ
আমার ভাষা আনন্দমঠ
আমার ভাষা বর্ণপরিচয়ে
আমার ভাষা শ্রীকান্ত
আমার ভাষা অমিত্রাক্ষর
আমার ভাষা গল্পে কবিতায়
উপন্যাসের পাতায় পাতায়
আমার ভাষা মুদ্রিত অক্ষরে
যা ছেড়ে যাচ্ছে আমাদের
মুঠো ফোনের কাছে ঝুঁকে নুয়ে
পড়ে আছি বহুদিন ধরে
ছেড়ে যাচ্ছে নাকি আমরা ছাড়ছি তাকে
অপূর্ব অপূর্ব তুমি

তোমায় নিয়ে বাঁচতে চাই
মানবের মাঝে এই পৃথিবীতে
দিনের পরে রাত, মৃত্যু থেকে নতুন জন্মে।।

মাতৃভাষা

— যুথিকা মণ্ডল
নবম শ্রেণি,
ভোজেরহাট সারদা দেশপ্রিয় বালিকা বিদ্যালয়

বাংলা আমার মাতৃভাষা
মাতৃদুগ্ধ সম
অনেকখানি জায়গা জুড়ে
অন্তরেতে মম
এই ভাষাতেই ভাব বিনিময়
দুঃখ, কান্না, হাসি
বাংলা আমার প্রাণের ভাষা
বড়ই ভালোবাসি
বাংলা মানে রবীন্দ্র-নজরুল
বাংলা মানে ছন্দ
বাংলা মানে বিদ্যাসাগর
কিম্বা জীবনানন্দ
বাংলা মানে চেতনা আবেগ
কেবল ভাষা নয়
বাংলা মানে উচ্চ কণ্ঠে
আমরা করবো জয়
বিশ্ব জোড়া নানা জাতি
নানা মত নানা ভাষা
বাংলা যে মোর বড়ই আপন
স্নেহ মমতায় ঠাসা।

চেতনায় একুশে

—শুভজিৎ পাত্র

একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করলেই কি হবে?
শুধু বছরের একটা দিন, চব্বিশটা ঘণ্টা!
যে আন্তরিক আবেগে একদা উদ্বেল হয়েছিল ঢাকার রাজপথ,
তার ভগ্নাংশও কি ধারণ করতে পেরেছি আমাদের সত্তায়?
যে ডাক মুক্তির, যে ডাক আকাশে মাথা তোলবার
সেই তীব্র তেজ কই আমাদের চেতনায়?
পুলিশের গুলির মুখে মাথা উঁচু রেখে সালাম, রফিকরা গেয়েছিল
মাতৃভাষার জয়গান
কিন্তু প্রতি পদে প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন ভাষায় নিজেকে মানিয়ে নিতে গিয়ে
আমাদের হারিয়ে গেছে মনের সজীবতা!
যদি রক্তের প্রতিটি কণায় মাতৃভাষার প্রকৃত মর্ম না করি অনুভব,তবে
একুশে ফেব্রুয়ারি নেহাতই একটি দিন।
তা ছাড়া অন্য কিছু নয়!

মাতৃভাষা

মাতৃভাষা শ্রেষ্ঠ ভাষা এই বিশ্ব ভুবনে
যে যার নিজের ম্যতভাষা বলে সেই লোকজনে।
ভাষাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ, ভাষাই মোদের শিক্ষা
মাতৃভাষা বলবো মোরা, করবো না ভাষার ভিক্ষা।
ভাষাই হলো শ্রেষ্ঠ উপায়, ভাষায় মোদের বিদ্যা
ভাষাই হবে সবচেয়ে বড়ো, করবো ভাষার চর্চা।
মাতৃভাষা শ্রেষ্ঠ ভাষা, ভাষাই সবার আগে
জ্ঞান লাভ করতে হলে ভাষাই কাজে লাগে।
ভাষার কাছে সবাই ছোটো, ভাষাই হলো বড়ো
জ্ঞান, বিদ্যা লাভ করতে হলে ভাষার চর্চা করো।
ভাষাই মোদের করবে বড়ো, করবে শিক্ষিত
মাতৃভাষা করবে মোদের সকলকে সম্মানিত।
মাতৃভাষাকে করবো মোরা সবাই সম্মান
বাংলা মোদের মাতৃভাষা, বাংলা মোদের প্রাণ।

অমর
২১
REDMI NOTE 11T 5G
12/02/2023 18:43

রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই
বাংলা হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা
বাংলা আমাদের মাতৃভাষা
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই আমাদের দাবী মানতে হবে।

অমর ভাষাদিবস

অমর ২১শে

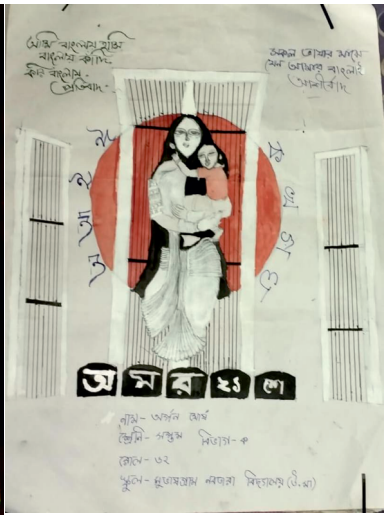

অমর হোক ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা দিবস
আমার ভাষা
তোমার ভাষা
বাংলা ভাষা

তোমার চলার পথ
আটকায় কে?
অমর ২১শে ফেব্রুয়ারী
ভাষা দিবস

একুশে ২৪

আব্দুল জব্বার

রফিক উদ্দিন আহমেদ

শফিউর রহমান

আব্দুস সালাম

আবুল বরকত

ঢাকার রাস্তায়

Anusandhan
dreaming success

অনুসন্ধান
কলকাতা